ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

একাদশ জাতীয় সংসদ

১ম হতে ২২তম অধিবেশন (জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩)

০১ অক্টোবর, ২০২৩

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষক
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ানটিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগীতা (খন্ডকালীন)
মিলি আক্তার, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
সাদিয়া সুলতানা, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
ফায়াজ উল্লাহ, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মুসাররাত মিশৌরি, *ইন্টার্ন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
রোকন আহমেদ, *ইন্টার্ন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করে সহযোগীতা করেছেন মো. জুলকারনাইন, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি। এছাড়া অন্যান্য সহকর্মীরা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ..৬

সংসদীয় শব্দকোষ...৭

অধ্যায় এক ১০

ভূমিকা ১০

গবেষণার পটভূমি...১১

গবেষণার উদ্দেশ্য..১১

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য..১১

গবেষণার পরিধি..১১

গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ ১১

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ..১২

গবেষণার তথ্যের সময়কাল ১২

অধ্যায় দুই...১৩

একাদশ জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী ১৩

সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক আসনবিন্যাস..১৪

সংসদ সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ ১৫

নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা...১৬

সংসদ সদস্যদের পেশাগত ও শিক্ষাগত তথ্যের অমিল ১৬

সংসদ সদস্যদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ...১৭

এক বা একাধিক মেয়াদে নির্বাচিত সদস্যদের হার ১৭

অন্যান্য তথ্য..১৮

একাদশ সংসদের অধিবেশনসমূহের কার্যকাল..১৮

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন ২০

একাদশ সংসদের কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়...২১

অধ্যায় তিন ২৩

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ২৩

রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়সমূহ ও ব্যয়িত সময়..২৩

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময় ২৪

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্য ২৫

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্য ২৮

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্য..২৯

অধ্যায় চার ৩২

আইন ও বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম ৩২

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়....................................৩২
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ....................................৩৩
বিল উত্থাপন, বিলের ওপর আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ....................................৩৩
কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন....................................৩৩
জনমত যাচাই-বাছাই এবং সংশোধনী প্রস্তাব....................................৩৪
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক....................................৩৫
বাজেট আলোচনা....................................৩৭
বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়....................................৩৭
বাজেট আলোচনায় দলীয় অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়....................................৩৮
বাজেট বিষয়ক সাধারণ আলোচনায় আলোচ্য বিষয়সমূহ....................................৪০
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা....................................৪২
অধ্যায় পাঁচ....................................৪৩
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম....................................৪৩
প্রশ্নোত্তর পর্ব....................................৪৩
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব....................................৪৩
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব....................................৪৫
অনির্ধারিত আলোচনা....................................৪৭
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী)....................................৪৯
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত ও অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি-৭১)....................................৫০
বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বিষয়ক আলোচনা....................................৫৩
বিধি ১৬৩ এর ওপর আলোচনা....................................৫৪
বিধি ২৭৪ এর ওপর আলোচনা....................................৫৪
মুলতবি প্রস্তাব....................................৫৫
৩০০ বিধিতে বক্তব্য....................................৫৬
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি....................................৫৬
সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ভূমিকা....................................৫৯
অধ্যায় ছয়....................................৬১
সংসদে নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা....................................৬১
সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব....................................৬১
একাদশ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব....................................৬২
নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা....................................৬২
সভাপতি মণ্ডলীর তালিকায় নারী সংসদ সদস্য....................................৬৩
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য....................................৬৩

অধিবেশনে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ৬৩
সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ৬৪
বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা ৬৪
অধ্যায় সাত ৬৫
সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা ৬৫
অধ্যায় আট ৬৭
সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ৬৭
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি ৬৭
সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা এবং মন্ত্রীদের উপস্থিতি ৬৮
সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ ৬৯
সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা ৭০
সংসদ চলাকালে সদস্যদের আচরণ এবং স্পিকারের ভূমিকা ৭১
সংসদ বর্জন ৭২
ওয়াকআউট ৭২
পদত্যাগ ৭২
কোরাম সংকট ৭২
তথ্যের উন্মুক্ততা ৭৩
অধ্যায় নয় ৭৪
পূর্বের সংসদগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৭৪
অধ্যায় দশ ৭৬
উপসংহার ও সুপারিশমালা ৭৬
সুপারিশ ৭৭
পরিশিষ্ট ৭৮

মুখবন্ধ

গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম। জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও সংস্কার, জন-প্রত্যাশা ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্ক এবং জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি'র) অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সহায়ক গবেষণা সম্পাদন ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই সংসদের অবশিষ্ট অধিবেশন সমাপ্তে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতমূলক এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক ভূমিকার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৯.২% আসন) নিয়ে সরকার গঠন করে। দশম সংসদের মত এই সংসদেও নির্বাচনকালীন মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে যা গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘাটতি, সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার অভাব, তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে সার্বিকভাবে সংসদের কার্যক্রম অনেকটাই কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন ও প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষদলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে বিরোধীদল প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে অনেকক্ষেত্রে বিরোধীদল হতে গঠনমূলক মতামত উত্থাপিত হলেও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের অনীহা লক্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্কের ঘাটতি ছিল। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় সার্বিক ভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও দেখা যায়নি এই সংসদে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরমার্জন করে সহয়তা করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ মো. জুলকারনাইন। তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সহযোগিতা করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের গবেষণা সহকারী মিলি আক্তার ও সাদিয়া সুলতানা। এছাড়া এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদান করে অন্যান্য সহকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এই প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবিত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সংসদীয় শব্দকোষ

স্পিকার: স্পিকার হচ্ছেন সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।[১]

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য বলতে সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন বলতে সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমাকে বোঝানো হয়েছে যা কার্য-উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: ফ্লোর আদান-প্রদান বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া এবং কথা শেষ হলে আরেক জনকে সুযোগ দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন বলতে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে শব্দ, বাক্য বা বাক্যের অংশ বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিশের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।[২]

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে ‘বিল’ বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

সংশোধনী বিল: কোনো আইনের কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন হলে তা যুক্ত করে সংশোধনী (খসড়া) বিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন করা হয় পাসের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[৩]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব: সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[৪] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

---

[১] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৪ দ্রষ্টব্য।

[২] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৮ দ্রষ্টব্য।

[৩] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৪১-৫৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] প্রাগুক্ত

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোনো সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।[৫]

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোনো জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। বিধি ১৪৮ অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিশের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা হতে হবে। [৬]

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোনো সদস্য অনূন্য আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অনূন্য দুই দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ দিতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এসব নোটিশ থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিশ গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিশ গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এই পর্বের মোট সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।[৭]

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে (সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কিত হতে হবে, একই অধিবেশনে অন্য কোনো পর্বে আলোচিত হয়নি এমন বিষয় হবে, বাজেট আলোচনার মধ্যে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না, আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় হতে পারবে না, রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করা যাবে না ইত্যাদি)। বিধি ৬৫ অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিশের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। অথবা তিনি বিধি ৬৬ অনুসারে প্রাপ্ত নোটিশের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব অধিবেশনে ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।[৮]

বিশেষ অধিকার প্রশ্নের নোটিশ: কার্যপ্রণালী বিধির ১৬৫ বিধি অনুযায়ী কোনো সদস্যের বা সংসদের বা সংসদের কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার সাপেক্ষে যে কোনো সদস্য প্রশ্ন তুলতে পারবেন।[৯]

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত: কার্যপ্রণালী বিধির ২৭৪ বিধি মোতাবেক স্পিকারের অনুমতি নিয়ে কোনো সদস্য কোনো বিষয়ে ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দানের জন্য বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে কোন বিতর্কমূলক বিষয় উত্থাপন করা যাবে না বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে না।[১০]

মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি: কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০ বিধি মোতাবেক কোন মন্ত্রী স্পিকারের অনুমতি নিয়ে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করতে পারবেন। তবে বিবৃতি প্রদানের সময় মন্ত্রীকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে না।[১১]

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ৩০১[১২] অনুসারে কোন একটি কার্যক্রমের সমাপ্তি ও অন্য একটি কার্যক্রমের শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোনো বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

---

[৫] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ১৩০-১৩৭ দ্রষ্টব্য।

[৬] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ১৪৬-১৫৮ দ্রষ্টব্য।

[৭] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৬৮-৭১ দ্রষ্টব্য।

[৮] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৬১-৬৭ দ্রষ্টব্য।

[৯] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ১৬৩-১৭২ দ্রষ্টব্য।

[১০] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ২৭৪ দ্রষ্টব্য।

[১১] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৩০০ দ্রষ্টব্য।

[১২] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি (ইংরেজি সংস্করণ)*, *বিধি ৩০১* দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা: সংবিধানের ৭৩-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের পর উক্ত ভাষণ নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করবেন।[১৩]

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর উপবিধি-৬ অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না এবং উপবিধি-৯ অনুসারে কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যের উল্লেখ করবেন না ও সংসদ বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যাবেনা।[১৪]

সংসদ বৈঠক চলাকালীন পালনীয়: বিধি ২৬৭ এর উপবিধি-২ অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাধা প্রদান করবেন না; উপবিধি-৪ অনুসারে সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোনো সদসস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না; উপবিধি-৮ অনুসারে স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না এবং সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করবেন।[১৫]

স্পিকারের দায়িত্ব: বিধি-১৪ অনুসারে সকল বৈধতার প্রশ্ন নিস্পত্তি করবেন, বিধি-১৫ অনুসারে কোনো সদসস্যের বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন, বিধি-৩০৩ অনুসারে সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, ৩০৭ অনুসারে সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করতে পারবেন।[১৬]

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।[১৭]

সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[১৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[১৯] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন হিসেবে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

[১৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৩ দ্রষ্টব্য।

[১৪] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি* ২৬৭-২৭৭ দ্রষ্টব্য।

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি* ১৪-১৯ এবং ৩০৩ ও ৩০৭ দ্রষ্টব্য।

[১৭] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি* ৩০৪ এবং *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৫ দ্রষ্টব্য।

[১৮] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[১৯] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ দ্রষ্টব্য।

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

স্বাধীনতা পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে ওয়েস্টমিনিস্টার মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম। জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্য ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-এর মতে, সংসদ হচ্ছে গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কারণ এর মাধ্যমে জনগণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। [২০]

বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনারও সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। সংসদ সদস্যগণ সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[২১] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০' এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭-এ যথাক্রমে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২'-এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন[২২] এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন[২৩] -এর সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও সংসদীয় কার্যকারিতা

নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করায় দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় এই নির্বাচনের পূর্বেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বে গঠিত জোট ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানালেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তীতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক অবস্থানের কারণে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়নি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৯ শতাংশ আসন) নিশ্চিত হয়। এই নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হয়নি।[২৪]

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ বা সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে কার্যকর করার বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেখা যায়নি। নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা নিয়ে বিভিন্ন দল অঙ্গীকার করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী

---

[২০] Beetham, D. 2006. Parliament and Democracy in the Twenty First Century: A Guide to Good Practice. Geneva: Inter-Parliamentary Union (IPU).

[২১] জবাবদিহির অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics,* New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[২২] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭২।

[২৩] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭৩।

[২৪] https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Bangladeshi_general_election

ইশতেহারে বলা হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে যেখানে সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল, এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে।[২৫] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয় সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা হবে; একাধারে পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান করা হবে; মন্ত্রীসভাসহ প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হবে; বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ দেওয়া হবে; সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে শর্তসাপেক্ষে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা হবে; বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে 'জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হবে; সংবিধানে 'গণভোট' ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃস্থাপন করা হবে; সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে এবং জাতীয় সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে।[২৬] এছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন এবং কমিটিসমূহের প্রকাশ্য গণশুনানির ব্যবস্থা চালু করা হবে; সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে এবং বর্তমানে এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদের বদলে শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-নারী-ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-আদিবাসী-স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে সংসদে উচ্চকক্ষ গঠন করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি।[২৭]

গবেষণার পটভূমি

বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর একটি, নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর একটি এবং দশম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর একটি করে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ৫ম অধিবেশনের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, একাদশ জাতীয় সংসদের উপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন হিসেবে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হচ্ছে, যেখানে এই সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদের (১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের) কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সংসদ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্ব এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা; এবং
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের (জানুয়ারি ২০১৯-এপ্রিলা ২০২৩) সংসদীয় এবং স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ

এই গবেষণায় মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের পদ্ধতি ও তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১ম হতে ২২তম

[২৫] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*।

[২৬] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*।

[২৭] জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*।

সংসদ অধিবেশনের প্রায় ৭৪৪ ঘণ্টা রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন; অনুলিপি ও নথিপত্র হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের প্রায় ৭৪৪ ঘণ্টার কার্যক্রমের রেকর্ড দেখে ও শুনে অনুলিপি প্রণয়ন করা হয় এবং নির্দিষ্ট ফরমেটে সংগৃহীত তথ্য সাজানো হয়। কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, সদস্যদের উপস্থিতি, কোরাম সংকট, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম, সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, স্পিকারের ভূমিকা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য, সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন ইত্যাদি সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড হতে সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের যথাযথতা নিশ্চিতের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় সেকেন্ডের হিসেবে সংগ্রহ ও গণনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যের জন্য উল্লিখিত পরোক্ষ তথ্যের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য মুখ্য তথ্যদাতাদের যে সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো অনুরূপ প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল তথ্য হতে সুনির্দিষ্ট ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং বিশ্লেষিত তথ্যের ফলাফলের ভিত্তিতেই গবেষণার ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিতের সম্ভাব্য সকলক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল একাধিকবার যাচাই করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত যেসব মূল ও অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

সারণি-১.১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি	সংসদের আসন বিন্যাস; সদস্যদের পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য তথ্য এবং কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব	রাষ্ট্রপতির বক্তব্য এবং সদস্যদের বক্তব্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট	বিল পাসের হার ও ব্যয়িত সময়; আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ; এবং বাজেট বিষয়ক আলোচনা
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম	প্রশ্নোত্তর পর্ব; কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন বিধি (৬২, ৭১, ১৪৭, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০); পয়েন্ট অব অর্ডার; সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-এ সদস্যদের অংশগ্রহণ, আলোচ্য বিষয়বস্তু ও ব্যয়িত সময় এবং স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনে সদস্যদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি; সদস্যদের আচরণ; উপস্থিতি; সংসদ বর্জন; ওয়াকআউট; কোরাম সংকটের ব্যয়িত সময় ও এর প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা
সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রমের গণপ্রচারণা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা
অন্যান্য বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা

গবেষণার তথ্যের সময়কাল

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়কালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সাময়িক আদেশ ১৯৭২ জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। উক্ত সরকারের অধীনেই ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মোট ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের অধীনে। পরবর্তী ৩টি নির্বাচন অর্থাৎ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সামরিক সরকারের অধীনে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম এই ৪টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলেও এ সরকার ব্যবস্থা তখন সংবিধানের অংশ ছিল না। ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রধান তিনটি বিরোধী দল একযোগে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রস্তাব করেন। গণআন্দোলন ও বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং সময় স্বল্পতার কারণে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ার কারণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমতের ভিত্তিতেই সাংবিধানিক সংশোধনী ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এবং উক্ত সরকারের অধীনেই পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারের অধীনে সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোটারের (২১%) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আইন হিসেবে পাস করা হয়। এই নির্বাচনের অধীনে সংসদ অধিবেশন স্থায়ী ছিল চার কার্যদিবস এবং সংসদ স্থায়ী ছিল ১২ দিন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং পরবর্তী দুইটি নির্বাচন অর্থাৎ অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও উক্ত আইনের অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালে নবম জাতীয় সংসদের বৈঠকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।[২৮] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হলে অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকারের অধীনে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের ৭২(৩)[২৯] অনুচ্ছেদ মোতাবেক স্বাভাবিক অবস্থায় (যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতিরেকে) সংসদের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ বছরের অধিক সময় অতিক্রম করবে না। বর্তমানে একাদশ জাতীয় সংসদ চলমান রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ বাদে পূর্ববর্তী ১০টি জাতীয় সংসদের মধ্যে মোট চারটি সংসদ (সপ্তম হতে দশম জাতীয় সংসদ) পাঁচ বছর মেয়াদকাল সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ চার বছর আট মাস মেয়াদকাল সম্পন্ন করে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল আড়াই বছর থেকে তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে ছিল। তৃতীয় সংসদ দেড় বছরেরও কম সময়েই সমাপ্ত ঘোষিত হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে স্বল্পকালীন সংসদ ছিল ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ, যার স্থায়ীত্বকাল ছিল মাত্র ১২ দিন। সংবিধান মোতাবেক সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদকাল হিসেবে চলমান একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সমাপ্ত করার শেষ তারিখ ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি।

সারণি ২.১: জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ও নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা[৩০]

সংসদ নির্বাচন	নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা	সংসদের মেয়াদকাল	মোট সময়
প্রথম	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার)	৭ এপ্রিল ১৯৭৩ - ৬ নভেম্বর ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয়	সামরিক সরকার	২ এপ্রিল ১৯৭৯ - ২৮ মার্চ ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয়	সামরিক সরকার	১০ জুলাই ১৯৮৬ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ	সামরিক সরকার	১৫ এপ্রিল ১৯৮৮ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার	৫ এপ্রিল ১৯৯১ - ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার	১৯ মার্চ ১৯৯৬ - ৩০ মার্চ ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার	১৪ জুলাই ১৯৯৬ - ১৩ জুলাই ২০০১	৫ বছর
অষ্টম	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার	২৮ অক্টোবর ২০০১ - ২৭ অক্টোবর ২০০৬	৫ বছর
নবম	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার	২৫ জানুয়ারি ২০০৯ - ২৪ জানুয়ারি ২০১৪	৫ বছর
দশম	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার	২৯ জানুয়ারি ২০১৪ - ২৮ জানুয়ারি ২০১৯	৫ বছর
একাদশ	অন্তর্বর্তীকালীন দলীয় সরকার	৩০ জানুয়ারি ২০১৯ - চলমান	-

[২৮] Md Zakir Hossain and M Jashim Ali Chowdhury, 'The Caretaker Government: A Constittutional Evaluation and Search for Alternative' The Chittagong University Journal of Law, ISSN: 073-5448 Vol. XIX, 2014 (pp. 228-263).
[২৯] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৪ দ্রষ্টব্য, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/part-details-420.html viewed on 01 July, 2023
[৩০] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, http://www.parliament.gov.bd/index.php/en/about-parliament/tenure-of-parliament viewed on 01 July, 2023

সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক আসনবিন্যাস

একাদশ জাতীয় সংসদে ৩৫০টি আসনের বিপরীতে ৩০০ জন সদস্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে ৫০ জন নারী সদস্য সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মোট ১,৭৩৩ জন প্রার্থী এবং ১২৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। গাইবান্ধা-৩ আসনের একজন মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনের প্রাক্কালে (১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে) মৃত্যুবরণ করায় নির্বাচন কমিশন আসনটিতে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে, পরবর্তীতে ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে উক্ত আসনে পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৯টি, জাতীয় পার্টি ২২টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি তিনটি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দুইটি, জাতীয় পার্টি (জেপি) একটি, তরিকত ফেডারেশন একটি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ দুইটি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ছয়টি, গণফোরাম দুইটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দুইটি আসনে জয়ী হন[৩১]। উল্লেখ্য, সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ছয়টি আসনের বিপরীতে একটি করে নারী আসন সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনে আওয়ামী লীগ হতে ৪৩ জন, জাতীয় পার্টি হতে চারজন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি হতে একজন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) হতে একজন, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে একজন মনোনয়ন পান। বর্তমানে সরাসরি নির্বাচিত আসনে ২৩ জন নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। একাদশ জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্য ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং নারী সংসদ সদস্য ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২০ দশমিক ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বৈশ্বিক পরিসরে সংসদে নারীদের আসনের অনুপাত গড়ে শতকরা ২৬ শতাংশ।[৩২] এক্ষেত্রে সংসদে নারী সদস্যের হার সবচেয়ে বেশি রুয়ান্ডা ও কিউবাতে, যথাক্রমে ৬১ দশমিক ৩ ও ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়া উভয় ক্ষেত্রেই এই হার সবচেয়ে বেশি নেপালে ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই হার ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ।[৩৩] একাদশ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

সারণি ২.২: একাদশ জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দল ও আসন সংখ্যা[৩৪]

রাজনৈতিক দল	মোট			
	নির্বাচিত আসন		সংরক্ষিত আসনসহ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সরকারি দল				
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৯	৮৬.৩	৩০২	৮৬.৩
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	১.১	৪	১.১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২	০.৬	২	০.৬
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	০.৬	২	০.৬
তরিকত ফেডারেশন	১	০.৩	১	০.৩
জাতীয় পার্টি-জেপি	১	০.৩	১	০.৩
প্রধান বিরোধী দল				
জাতীয় পার্টি	২২	৭.৪	২৬	৭.৪
অন্যান্য বিরোধী দল[৩৫]				
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬	২.০	৭	২
গণফোরাম	২	০.৬	২	০.৬
স্বতন্ত্র সদস্য	২	০.৯	৩	০.৯
মোট	**৩০০**	**১০০**	**৩৫০**	**১০০**

[৩১] গাইবান্ধা ৩ আসনের নির্বাচনী ফলাফলসহ দেখানো হয়েছে।

[৩২] https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?end=2022&name_desc=false&start=1997&view=chart viewed on 15 July, 2023

[৩৩] https://data.ipu.org/women-ranking?month=12&year=2022 viewed on 21 July, 2023

[৩৪] একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বছরে সংসদ সংসদের আসন বিন্যাস অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সারণি। ২০তম অধিবেশনের পর অন্যান্য বিরোধীদল হতে একটি দলের সকল সদস্য পদত্যাগের পর উক্ত শূন্য আসনগুলো উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ২১তম অধিবেশনে আসন বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিত সারণিটি দেখুন, পরিশিষ্ট-১ এ। এখানে উল্লেখ্য, গবেষণার সকল তথ্য বিশ্লেষণে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বছরের আসন বিন্যাস এবং সদস্যদের হলফনামার তথ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

[৩৫] প্রতিবেদনে অন্যান্য বিরোধীদল বলতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), গণফোরাম ও স্বতন্ত্র সদস্যদেরকে একত্রে বোঝানো হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের হলফনামায় উল্লেখিত পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সংসদ সদস্যদের এক বা একাধিক পেশা আছে এবং সেই বিবেচনায়, সর্বোচ্চ ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী, আইনজীবী ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ, কৃষিজীবী ১১ দশমিক ৪ শতাংশ, রাজনীতিবিদ ১০ দশমিক ৯ শতাংশ, চিকিৎসক ৪ শতাংশ, শিক্ষক ৩ দশমিক ৯ শতাংশ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশাজীবী ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যান্য পেশার মধ্যে সাংবাদিক, পরামর্শদাতা/উপদেষ্টা/মানবাধিকার কর্মী, সমাজকর্মী, অভিনেতা, খেলোয়াড় ইত্যাদি পেশা উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ২.১: একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের পেশা (শতাংশ)

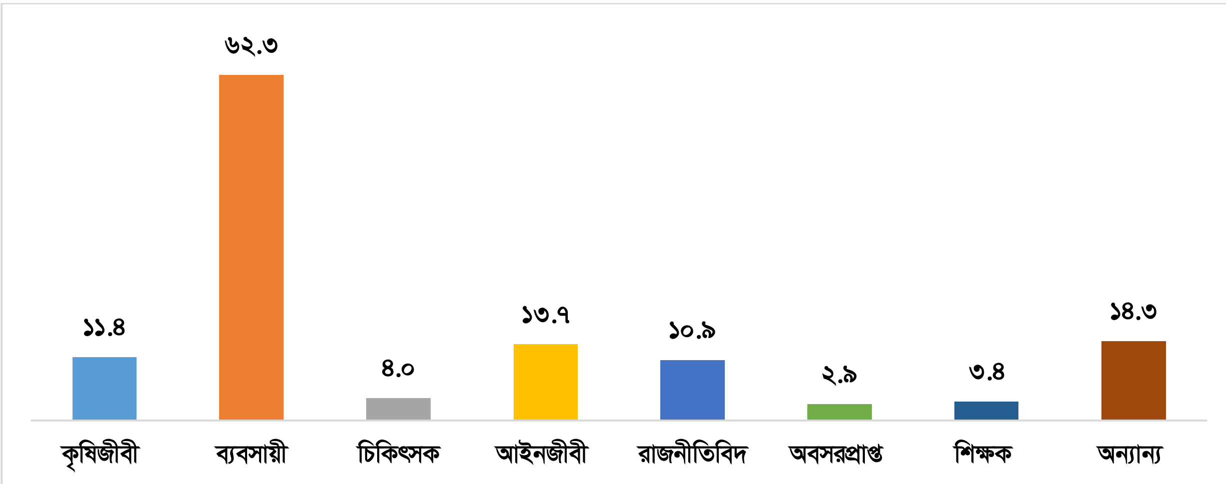

দলভেদে পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সকল দলেই ব্যবসায়ীদের অনুপাত তুলনামূলকভাবে প্রায় একই রকম। এক্ষেত্রে সরকারি দলের শতকরা ৬২ দশমিক ২ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের শতকরা ৬৬ দশমিক ৭ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী। অন্যদিকে ভারতের ১৭তম লোকসভায় সংসদ সদস্যদের মধ্যে রাজনীতিবিদ ৩৯ শতাংশ, ব্যবসায়ী ২৩ শতাংশ, আইনজীবী ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশার সদস্য রয়েছেন ৩৮ শতাংশ।[৩৬]

চিত্র ২.২: একাদশ জাতীয় সংসদ এবং ভারতের ১৭তম লোকসভার সদস্যদের প্রধান পেশার তুলনামূলক চিত্র (শতাংশ)

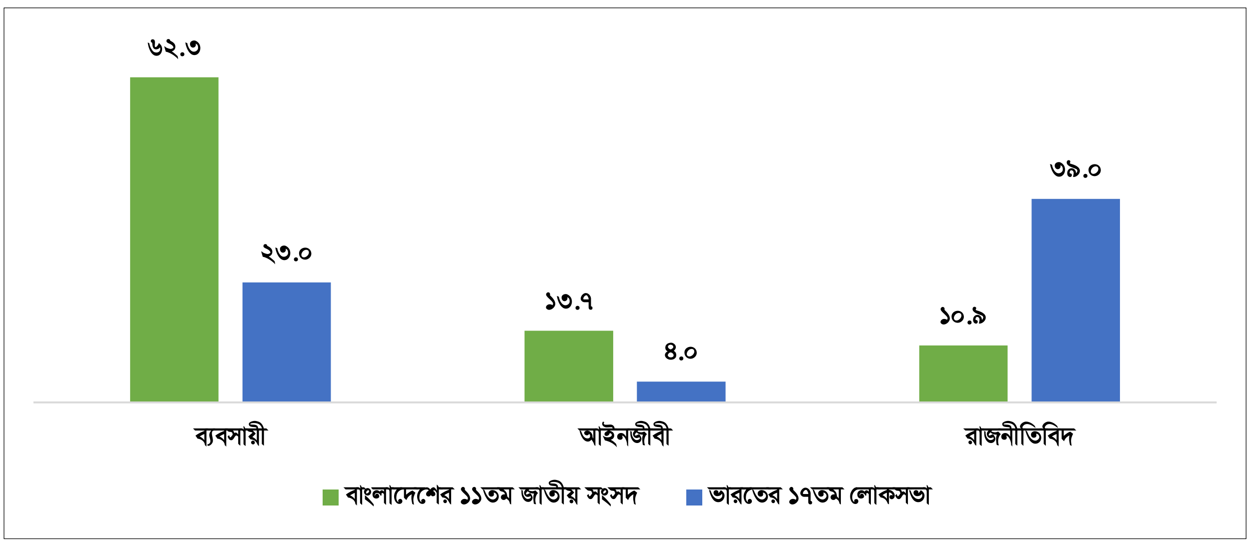

[৩৬] https://prsindia.org/ viewed on 15 March, 2020

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার ৩১ শতাংশ ছিল যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে একাদশ সংসদে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৮ শতাংশ ছিল যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে একাদশ সংসদে ৬২ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

চিত্র ২.৩: কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান দুটি পেশার তুলনামূলক চিত্র (শতাংশ)

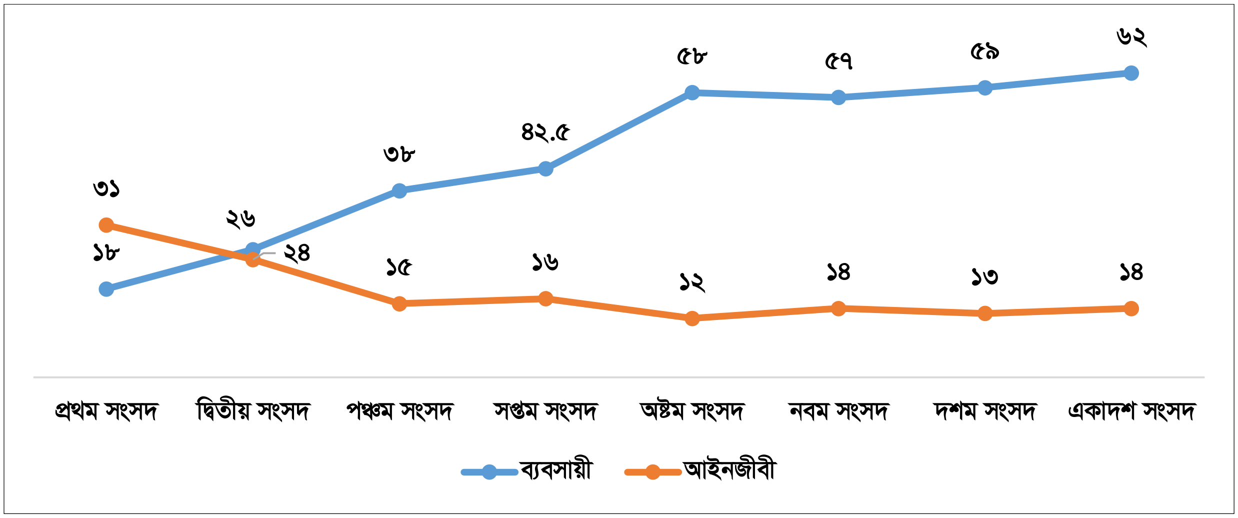

নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

একাদশ সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ১ শতাংশ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর/তদূর্ধ্ব, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ সদস্য স্নাতক, উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ১১ দশমিক ১ শতাংশ, মাধ্যমিক সমমানের ২ দশমিক ৮ শতাংশ, নিম্নমাধ্যমিক ১ দশমিক ৪ শতাংশ, স্বশিক্ষিত ৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্বাক্ষরজ্ঞান শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ।

চিত্র ২.৪: একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (শতাংশ)

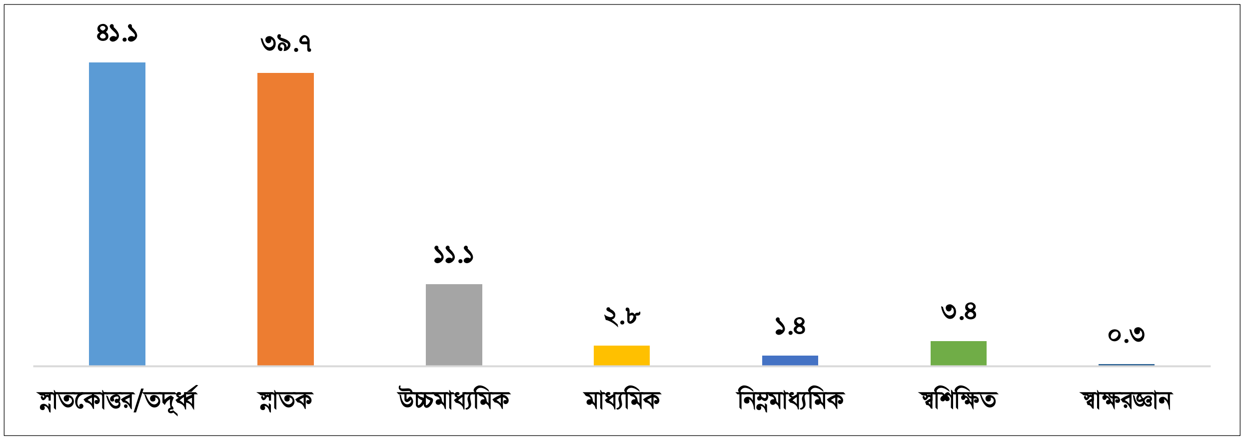

সংসদ সদস্যদের পেশাগত ও শিক্ষাগত তথ্যের অমিল

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায়[৩৭] প্রদত্ত তথ্যের সাথে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে[৩৮] সংসদ সদস্যদের পেশাগত ও শিক্ষাগত তথ্যের কিছু অমিল রয়েছে। পেশাগত তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৪৬ জন (১৩ শতাংশ) সংসদের পেশার ক্ষেত্রে হলফনামা এবং ওয়েবসাইটে ভিন্নতা রয়েছে। যাদের মধ্যে ২২ জন সদস্যের ক্ষেত্রে হলফনামায় যাদের পেশা ব্যবসায়ী দেখানো হয়েছে সেখানে ওয়েবসাইটে তাদের পেশা দেখানো হয়েছে

[৩৭] বিস্তারিত দেখুন, http://www.ecs.gov.bd/page/holofnnama-np viewed on 15 April, 2020
[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, http://www.parliament.gov.bd/index.php/en viewed on 15 April, 2020

রাজনীতিবিদ অথবা আইনজীবী অথবা শিক্ষক।[৩৯] শিক্ষাগত তথ্যের ক্ষেত্রে, ৩৮ জন (১১ শতাংশ) সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে হলফনামা ও ওয়েবসাইটে ভিন্নতা রয়েছে। ওয়েবসাইটে ৩৩ জন সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা হলফনামা হতে একস্তর ওপরে অথবা নিচে দেখানো হয়েছে। দুইজন সদস্যে ক্ষেত্রে কয়েক স্তর ওপরে দেখানো হয়েছে। তিনজন সদস্যের ক্ষেত্রে যারা হলফনামায় নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়েছেন স্বশিক্ষিত তা সংসদের ওয়েবসাইটে দেখানো হয়েছে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর হিসেবে।[৪০]

সংসদ সদস্যদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ

একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় বয়স ৬৩ বছর। সদস্যদের মধ্যে সর্বনিম্ন ৩২ বছর হতে সর্বোচ্চ ৮৮ বছর বয়সী সদস্য রয়েছেন। ৪০ বছর বা তার কম বয়সের সদস্য রয়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ, ৪১-৫০ বছর বয়সের সদস্য রয়েছেন ৮ দশমিক ৯ শতাংশ, ৫১-৬০ বছর বয়সের সদস্য রয়েছেন ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ, ৬১-৭০ বছর বয়সী সদস্য রয়েছেন ৩০ দশমিক ২ শতাংশ, ৭১-৮০ বছর বয়সী সদস্য রয়েছেন ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ৮০ বছরের উর্ধ্বে সদস্য রয়েছে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ, ভারতের ১৭তম লোকসভা এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সের সদস্যদের বয়সভিত্তিক হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় যে, একাদশ জাতীয় সংসদের ২৬-৬০ বছর বয়সী সদস্যদের সংখ্যা ষাটোর্ধ্ব বয়সী সদস্যদের তুলনায় কম, যথাক্রমে ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ ও ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে ১৭তম ভারতীয় লোকসভা এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্স উভয়ক্ষেত্রেই ২৬-৬০ বছর বয়সী সদস্যদের সংখ্যা ষাটোর্ধ্ব বয়সী সদস্যদের তুলনায় বেশি ছিল। ভারতীয় লোকসভায় এই হার ছিল যথাক্রমে ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ ও ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সে এই হার ছিল যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৮ শতাংশ ও ২৭ দশমিক ২ শতাংশ।

চিত্র ২.৫: একাদশ জাতীয় সংসদ, ভারতের ১৭তম লোকসভা এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সের সদস্যদের বয়সের তুলনামূলক চিত্র (শতাংশ)

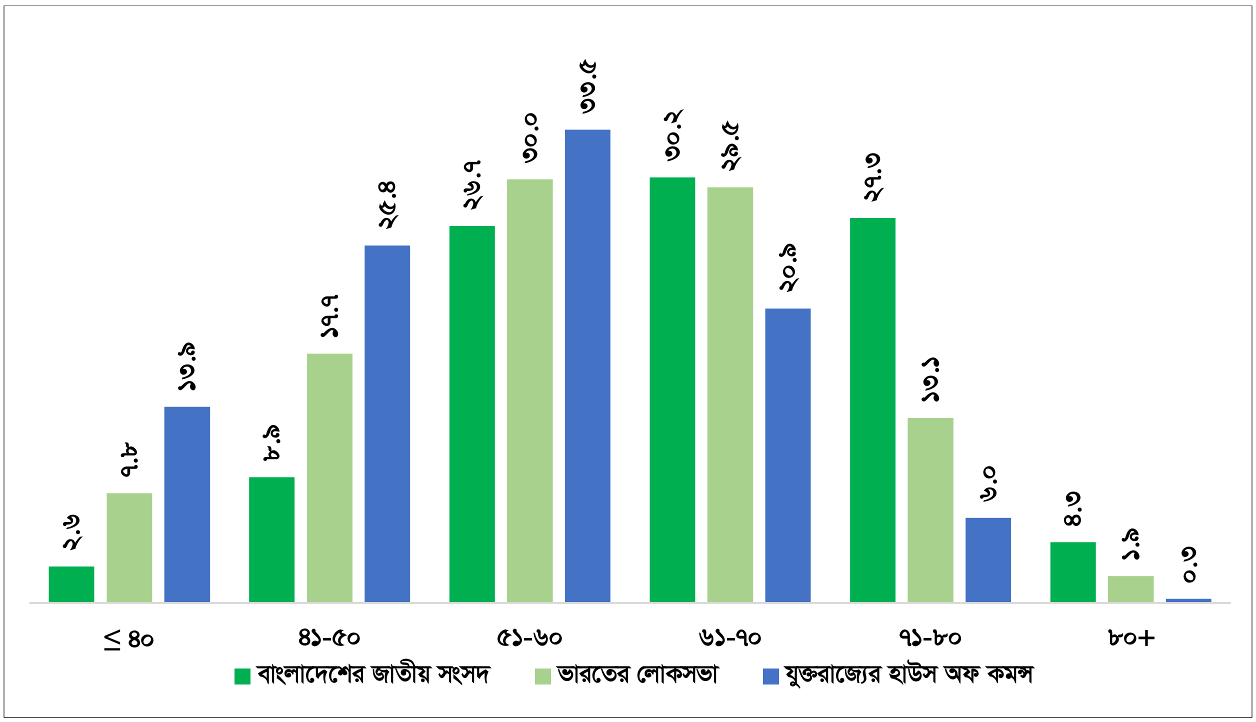

এক বা একাধিক মেয়াদে নির্বাচিত সদস্যদের হার

একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ১২৪ জন (৩৫.৪%) সদস্য প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়ে সংসদে সদস্যপদ লাভ করেছেন। যেখানে ২২৬ জন (৬৪.৬%) সদস্য সর্বনিম্ন দ্বিতীয়বার হতে সর্বোচ্চ অষ্টমবারের মতো নির্বাচিত হয়ে সংসদে সদস্যপদ লাভ করেছেন। দ্বিতীয়বারের মতো ৭৯ জন (২২.৬%), তৃতীয়বারের মতো ৭৫ জন (২১.৪%), চতুর্থবারের মতো ৩৭ জন (১০.৬%), পঞ্চমবারের মতো (৫.১%), ষষ্ঠবারের মতো আটজন (২.৩%), সপ্তমবারের মতো আটজন (২.৩%) এবং অষ্টমবারের মতো একজন (০.৩%) সদস্য নির্বাচিত

[৩৯] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৩

[৪০] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২

হয়ে সংসদে সদস্যপদ লাভ করেছেন। ভারতীয় লোকসভার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ সদস্য প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় সদস্যপদ লাভ করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হয়ে সদস্যপদ লাভ করার হার বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের লোকসভায় বেশি। এ হার বাংলাদেশে মোট ৫৮ দশমিক শূন্য শতাংশ যা ভারতে ৭৭ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে তৃতীয় হতে অষ্টম দফায় নির্বাচিত হয়ে সদস্যপদ লাভ করার হার ভারতের লোকসভার তুলনায় বাংলাদেশে বেশি। এ হার বাংলাদেশে মোট ৪২ শতাংশ যা ভারতে ২২ দশমিক ৪ শতাংশ।

চিত্র ২.৬: একাদশ জাতীয় সংসদ ও ভারতের ১৭তম লোকসভায় এক বা একাধিক মেয়াদে নির্বাচিত সদস্যদের হার (শতাংশ)

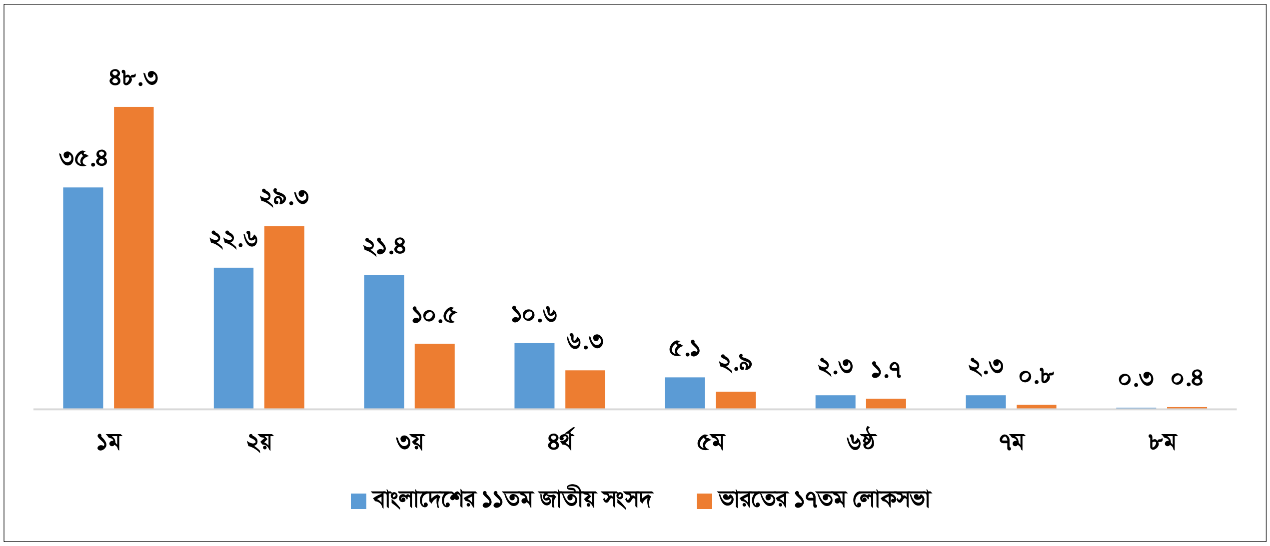

অন্যান্য তথ্য

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা অনুসারে, নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২১ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে।[৪১]

একাদশ সংসদের অধিবেশনসমূহের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। এবং অনুচ্ছেদ ৭২(২) অনুযায়ী যে কোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করবেন।[৪২] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত প্রথম হতে ২২তম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ২৩২ দিন। একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের মোট ২৬ কার্যদিবস ছিল যা ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ শুরু হয়ে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল পাঁচ দিন যা ২৪ এপ্রিল ২০১৯ শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ১১ জুন ২০১৯ এবং সমাপ্ত হয় ১১ জুলাই ২০১৯। ২১ কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি ছিল বাজেট অধিবেশন। চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং সমাপ্ত হয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯। কার্যদিবস ছিল চার দিন। পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয় ৭ নভেম্বর ২০১৯ এবং সমাপ্ত হয় ১৪ নভেম্বর। এই অধিবেশনের কার্যদিবস ছিল পাঁচ দিন। এটি ছিল ২০১৯ সালের শেষ অধিবেশন। ৯ জানুয়ারি ২০২০ ষষ্ঠ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে ২০২০ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ২৮ কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি সমাপ্ত হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে। সপ্তম অধিবেশনটি ছিল সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে শুরু হয়ে উক্ত দিনেই এই অধিবেশনটি সমাপ্ত করা হয়। অষ্টম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল নয় দিন যা ১০ জুন ২০২০ তারিখে শুরু হয়ে ৯ জুলাই ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়। এই অধিবেশনটি ছিল ২০২০ সালের বাজেট অধিবেশন। নবম অধিবেশন ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে শুরু হয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়, মোট কার্যদিবস ছিল পাঁচ দিন। দশম অধিবেশন ৮ নভেম্বর ২০২০ শুরু হয়ে সমাপ্ত হয় ১৯ নভেম্বর ২০২০, মোট কার্যদিবস ছিল ১০ দিন। এগারোতম অধিবেশনের মাধ্যমে ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের কার্যদিবস ছিল মোট ১২ দিন যা ১৮ জানুয়ারি ২০২১ শুরু হয়ে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বারোতম অধিবেশন শুরু হয় ১ এপ্রিল ২০২১ এবং তা সমাপ্ত হয় ৪ এপ্রিল ২০২১, মোট কার্যদিবস ছিল তিন দিন। তেরোতম অধিবেশন শুরু হয় ২ জুন ২০২১ এবং সমাপ্ত হয় ৩ জুলাই ২০২১। ১২ কার্যদিবসের এই

[৪১] বিস্তারিত দেখুন, 'সুজনের তথ্য: সংসদ সদস্যদের ১৮২ জন ব্যবসায়ী' দৈনিক প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[৪২] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭২ দ্রষ্টব্য।

অধিবেশনটি ছিল বাজেট অধিবেশন। চৌদ্দতম অধিবেশনটি ছিল সাত দিনের। ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। পনেরোতম অধিবেশন শুরু হয় ১৪ নভেম্বর ২০২১ এবং সমাপ্ত হয় ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে। নয় কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি ছিল ২০২১ সালের শেষ অধিবেশন। ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ষোলতম অধিবেশনের মাধ্যমে ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশন শুর হয়। পাঁচ কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি সমাপ্ত হয় ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে। সতেরোতম অধিবেশন শুরু হয় ২৮ মার্চ ২০২২ এবং সমাপ্ত হয় ৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। মোট কার্যদিবস ছিল আটদিন। আঠারোতম অধিবেশনটি ছিল ২০২২ সালের বাজেট অধিবেশন। ৫ জুন ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে মোট ২০ কার্যদিবসে ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়। উনিশতম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল পাঁচ দিন। ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে উক্ত অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়। বিশতম অধিবেশনটি ছিল ২০২২ সালের শেষ অধিবেশন। ছয় কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি ৩০ অক্টোবর ২০২২ শুরু হয়ে ৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়। ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সালে একুশতম অধিবেশনের মাধ্যমে ২০২৩ সালের প্রথম সংসদ শুরু হয়। এই অধিবেশনটি মোট ২৬ কার্যদিবস সম্পন্ন করে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। ৭ এপ্রিল ২০২৩ সালে জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্ত হয়। জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বিশেষ অধিবেশন হিসেবে বাইশতম অধিবেশন শুরু হয়। পাঁচ কার্যদিবসের এই অধিবেশনটি ১০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭১ (১) অনুসারে সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের বেশি ব্যবধান না রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনগুলোতে দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালীন বিরতিকাল লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অধিবেশনে মধ্যবর্তীকালীন এই বিরতির সময় সর্বনিম্ন ৪১ দিন হতে সর্বোচ্চ ৫৯ দিন ছিল। এক্ষেত্রে গড়ে বিরতিকাল ছিল ৫৫দিন। সংসদ কার্যক্রমের বৈঠকভিত্তিক গড় ব্যয়িত সময় ছিল ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। [৪৩]

করোনা মহামারীর কারণে দেশের অন্যান্য কার্যক্রমের মতো সংসদ কার্যক্রমকেও সীমিত পরিসরে নিয়ে আসা হয়। মার্চ ২০২০-এ করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হওয়ার ৫৯ দিন পর নিয়ম রক্ষার্থে একদিনের জন্য একাদশ সংসদের সপ্তম অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। এক দিনের বৈঠকে ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট সময় ব্যয়ে এই অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়। করোনা সময়ে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনগুলো তুলনামূলকভাবে কম সময় ধরে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে করোনা সময়ে (মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২১) অনুষ্ঠিত দুইটি বাজেট অধিবেশনও (৮ম ও ১৩তম) তুলনামূলক কম সময়ে (যথাক্রমে ৯ ও ১২ দিন) সমাপ্ত করা হয় ।

বর্তমানে চলমান জাতীয় সংসদ চার বছর কাল সম্পন্ন করে পঞ্চম বছরে চলমান রয়েছে। পূর্ববর্তী তিনটি জাতীয় সংসদ অর্থাৎ, অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদ সম্পূর্ণভাবে পাঁচ বছর মেয়াদকাল সম্পন্ন করে সমাপ্ত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকলে একাদশ জাতীয় সংসদও পাঁচ বছর মেয়াদকাল সম্পন্ন করে সমাপ্ত হবার সম্ভবনা রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যকালকে অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদের কার্যকালের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় অধিবেশনের সংখ্যার দিক দিয়ে গড় বাৎসরিক অধিবেশনে একাদশ জাতীয় সংসদ তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকলেও একাদশ জাতীয় সংসদে মোট ও বাৎসরিক গড় কার্যদিবস এবং মোট ব্যয়িত সময়ের দিক থেকে তুলনামূলক ভাবে সবচেয়ে কম সময় ব্যয়িত হয়েছে । পূর্ববর্তী তিনটি সংসদে যেখানে বছরে গড়ে সর্বনিম্ন ৭৫ দিন হতে সর্বোচ্চ ৮৪ দিন পর্যন্ত সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে একাদশ জাতীয় সংসদে বাৎসরিক হিসেবে গড় কার্যদিবস ছিল ৫৩ দশমিক ৫ দিন। একইভাবে অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদে সংসদ কার্যক্রমে গড়ে বাৎসরিক ব্যয়িত সময় ছিল সর্বনিম্ন ২৩৮ ঘণ্টা হতে সর্বোচ্চ ২৮২ ঘণ্টা সেখানে একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ কার্যক্রমে গড় ব্যয়িত সময় ছিল ১৯০ ঘণ্টা যা পূববর্তী তিনটি সংসদের তুলনায় অনেকাংশে কম। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কার্যদিবসভিত্তিক গড় ব্যয়িত সময়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

সারণি ২.৩: অষ্টম হতে একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যকাল

অধিবেশন	মোট মেয়াদ কাল	অধিবেশন সংখ্যা	বছর ভিত্তিক গড় অধিবেশন সংখ্যা	মোট কার্যদিবস	বছরভিত্তিক গড় কার্যদিবস	মোট ব্যয়িত সময়	বাৎসরিক গড় ব্যয়িত সময়	কার্যদিবস ভিত্তিক গড় ব্যয়িত সময়
অষ্টম	৫ বছর	২৩	৪.৬	৩৭৩	৭৫	১,১৮৯ ঘণ্টা ২৯ মিনিট	২৩৮ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট
নবম	৫ বছর	১৯	৩.৮	৪১৮	৮৪	১,৩৩১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	২৬৬ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট
দশম	৫ বছর	২৩	৪.৬	৪১০	৮২	১,৪১০ ঘণ্টা ৯ মিনিট	২৮২ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট

[৪৩] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৪

একাদশ[৪৪]	চলমান	২২	৫.১	২৩২	৫৩.৫	৮২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট	১৯০ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট

অন্যান্য দেশের সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সংসদ কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় তুলনামূলকভাবে কম। যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সে ২০১৯-২১ অধিবেশনে দৈনিক কার্যক্রমের ব্যাপ্তিকাল ছিল গড়ে ৭ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট এবং ২০২১-২২ অধিবেশনে তা ছিল গড়ে ৭ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট।[৪৫] ভারতের লোকসভায় অধিবেশনের দৈনিক কার্যঘণ্টা হিসেবে সাধারণত ৬ ঘণ্টা নির্ধারিত থাকে। ২০১৯ সালে ১৭তম লোকসভার অধিবেশন কার্যক্রমের দৈনিক গড় ব্যয়িত সময় ছিল নির্ধারিত কার্যঘণ্টার ১৩৫ শতাংশ যা ঘণ্টার হিসেবে গড়ে আট ঘণ্টারও বেশি সময়।[৪৬] যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সে ২০১৯-২১ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ২০৫ দিন এবং ২০২১-২২ অধিবেশনে ছিল ১৫২ দিন। ২০১৯ সালের মে মাসে শুরু হওয়া ভারতের ১৭তম লোকসভায় ২০২৩ সালের বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস সম্পন্ন হয়েছে ২৩০ দিন। উল্লেখ্য, এই বাজেট অধিবেশনটিকে ১৯৫২ সাল হতে এই যাবৎকাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের ষষ্ঠ সংক্ষিপ্ততম বাজেট সেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪৭]

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে রংপুর-৬ আসন থেকে বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয় বারের মতো সংসদের স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো: ফজলে রাব্বী মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় বারের মতো সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। মো: ফজলে রাব্বী মিয়া একাদশ জাতীয় সংসদের ১৮তম বৈঠক পর্যন্ত ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালের ২২ জুলাই (বাংলাদেশ সময় ২০২২ সালের ২৩ জুলাই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করলে ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের ১৯তম বৈঠকে ডেপুটি স্পিকারের শূন্য পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা-১ আসন থেকে মোঃ শামসুল হক টুকু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম বারের মতো সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রতিটি অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১২ (১) বিধি অনুসারে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে মোট ৬২ জন সংসদ সদস্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সরকারি দল থেকে মোট ৫৮ জন সদস্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিল ৩৮ জন এবং ২০ জন ছিল নারী সদস্য। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ২৫ জন একবার করে এবং ১৩ জন সদস্য একাধিকবার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। একাধিকবার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত সদস্যরা দুই থেকে তিন বারের মতো উক্ত পদে নির্বাচিত হন। তবে দুই জন সদস্য সর্বোচ্চ ছয় ও আট বারের মতো সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। নারীদের মধ্যে নির্বাচিত আসন হতে ১০ জন এবং সংরক্ষিত আসন হতে ১০ জন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত আসন হতে একজন নারী সদস্য একের অধিকবার নির্বাচিত হন, তিনি মোট ৩ বার এ পদের জন্য নির্বাচিত হন। প্রধান বিরোধীদল হতে মোট ৪ জন সদস্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। উক্ত ৪ জন সদস্যই ছিলেন পুরুষ সদস্য এবং তাদের প্রত্যেকেই একাধিকবার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সর্বনিম্ন ২ বার হতে সর্বোচ্চ ১২ বারের মতো সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।[৪৮]

সারণি ২.৪: একাদশ জাতীয় সংসদে দলভিত্তিক সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হওয়ার চিত্র (১ম-২২তম)

দল	পুরুষ		নারী				মোট
			নির্বাচিত		সংরক্ষিত		
	একবার নির্বাচিত	একাধিকবার নির্বাচিত	একবার নির্বাচিত	একাধিকবার নির্বাচিত	একবার নির্বাচিত	একাধিকবার নির্বাচিত	
সরকারি দল	২৫	১৩	৯	১	৮	০	৫৮
প্রধান বিরোধীদল	০	৪	০	০	০	০	৪
মোট	২৫	১৭	৯	১	৮	০	৬২

[৪৪] ২০২৩ এর এপ্রিল পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া অধিবেশনের আলোকে ফলাফল দেখানো হয়েছে।

[৪৫] https://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-commons-faqs/business-faq-page/ viewed on 15 July, 2023

[৪৬] https://prsindia.org/parliamenttrack/vital-stats/parliament-functioning-in-first-session-of-17th-lok-sabha viewed on 15 July, 2023

[৪৭] https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/productivity-of-lok-sabha-and-implications viewed on 20 July, 2023

[৪৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৫

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে প্রায় ৮২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়। এর মধ্যে সভাপতি হিসেবে স্পিকার দায়িত্ব পালন করেন মোট ৬৪৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের ৭৮ দশমিক ৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ৭ম, ১২তম, ১৩তম ও ১৪তম অধিবেশনে তিনি এককভাবে সম্পূর্ণ সংসদ কার্যক্রমের সভাপতিত্ব করেন, যার মোট সময়কাল প্রায় ৫৯ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট এবং তা সংসদ কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের ৭ শতাংশ। ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে সংসদ কার্যক্রম পরিচালিত হয় মোট ১৪৮ ঘণ্টা ২২ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের ১৮ শতাংশ। ১২তম হতে ১৮তম মোট সাতটি অধিবেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সভাপতি হিসেবে ডেপুটি স্পিকার কোনো ভূমিকা পালন করেননি। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম এই ছয়টি অধিবেশনের মোট ১৮টি বৈঠকে সভাপতি প্যানেলের সদস্য কর্তৃক সংসদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভাপতি প্যানেলের মোট সাত জন সদস্য বিভিন্ন দফায় এই ভূমিকা পালন করে। সভাপতি প্যানেলের সদস্য কর্তৃক সংসদ কার্যক্রম পরিচালিত হয় মোট ৩০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ।[৪৯]

একাদশ সংসদের কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম হতে বিংশতম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট ৭৪৪ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।[৫০] সংসদ কার্যক্রমসমূহকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনা, আইন প্রণয়ন কার্যাবলী, বাজেট আলোচনা, জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম এবং সংসদীয় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম। রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ১৯১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময়ের ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময় ১২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। এক্ষেত্রে বিল উত্থাপন ও পাসে ব্যয়িত হয়েছে মোট ১১৭ ঘণ্টা ৬ মিনিট এবং বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনে ব্যয়িত হয়েছে মোট ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদের মোট ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত হয়েছে ১৯০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট যা সংসদের মোট ব্যয়িত সময়ের ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ। জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় ১৩ ঘণ্টা ২ মিনিট; মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় ৪৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট; ৭১ বিধির (ক ও খ) আলোচনা ব্যয়িত সময় ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট; ১৪৭ বিধিতে ব্যয়িত সময় ৬৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট; ৬২, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০ বিধিতে ব্যয়িত সময় ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট; দৃষ্টি আকর্ষণ বা পয়েন্ট অফ অর্ডারে বিভিন্ন সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন মোট ২২ ঘণ্টা ১১ মিনিট; বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উপস্থাপনে ব্যয়িত সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট এবং কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনে ব্যয়িত সময় ৫ ঘণ্টা ২১ মিনিট। বিশেষ কিছু কার্যক্রমে ব্যয় হয়েছে মোট ৯ ঘণ্টা ১৭ মিনিট যা মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ২ শতাংশ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচারে ব্যয় হয়েছে ৪ ঘণ্টা ২ মিনিট, পদ্মা সেতুর ওপর ভিডিও চিত্র উপস্থাপনে ব্যয় হয়েছে ২০ মিনিট, বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিয়েছেন ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট এবং ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে সংসদ সদস্যগণ সাধারণ আলোচনা করেছেন ২ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। এছাড়া সংসদের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৮৬ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ব্যয় হয় যা মোট ব্যয়িত সময়ের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে কোরআন তিলওয়াতে ব্যয় হয়েছে ১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট, শোক প্রস্তাবে ব্যয় হয়েছে ২৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট, কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনে ব্যয় হয়েছে ৫ ঘণ্টা, অধিবেশনের শেষ বৈঠকে সংসদ নেতা, উপনেতা ও স্পিকারের সমাপনী বক্তব্যে ব্যয় হয়েছে ২২ ঘণ্টা ২ মিনিট এবং অন্যান্য বিভিন্ন কার্যক্রমে মোট ব্যয় হয়েছে ২২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, সভাপতিমণ্ডলী মনোনয়ন, নব নির্বাচিত সদস্যদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, সংসদ কার্যক্রম বিষয়ক স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বক্তব্য, দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বক্তব্য, বিভিন্ন বিষয়ে স্পিকারের ঘোষণা, উপস্থাপনীয় কাগজপত্র, সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।[৫১]

---

[৪৯] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৬

[৫০] বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মোট ব্যয়িত সময় = (সংসদের মোট ব্যয়িত সময়- মোট বিরতিকাল)

[৫১] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৭

চিত্র ২.৭: একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমভিত্তিক ব্যয়িত সময়ের হার (শতাংশ)

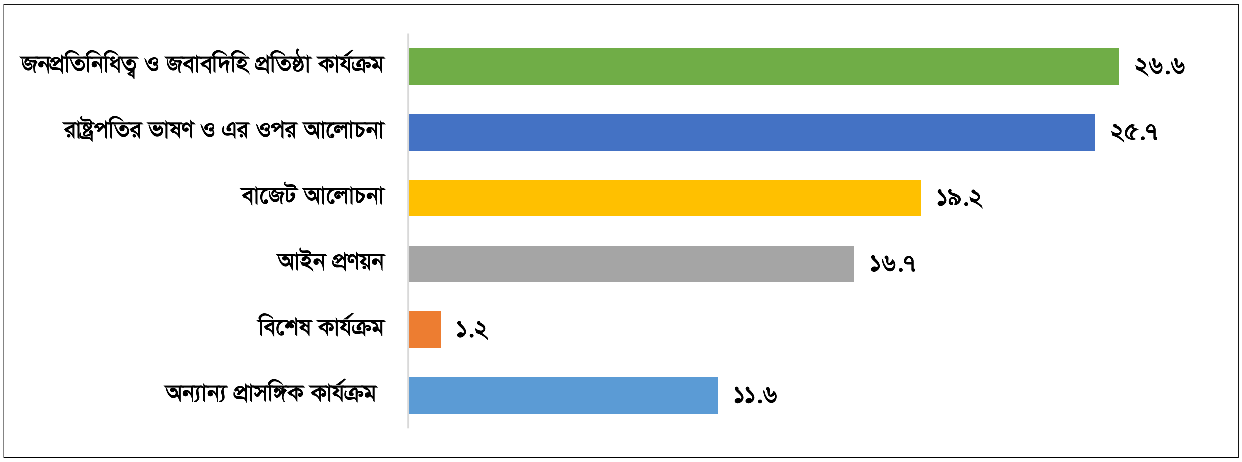

বিগত দুইটি জাতীয় সংসদ (নবম ও দশম জাতীয় সংসদ)[৫২] এর তুলনায় একাদশ জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে সার্বিকভাবে ব্যয়িত সময়ের হার তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নবম ও দশম জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় ছিল যথাক্রমে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ ও ২৪ দশমিক শূন্য শতাংশ যা একাদশ জাতীয় সংসদে হ্রাস পেয়ে দাড়িয়েছে ১৯ দশমিক ২ শতাংশে। জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি কার্যক্রমে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে ব্যয়িত হয়েছে যথাক্রমে ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ সময় যা একাদশ সংসদে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়েছে যথাক্রমে ৮ দশমিক ২ শতাংশ ও ১২ দশমিক শূন্য শতাংশ সময় যেখানে একাদশ সংসদে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার নবম ও দশম জাতীয় সংসদে ছিল যথাক্রমে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ ও ২১ দশমিক ৮ শতাংশ যা একাদশ জাতীয় সংসদে এসে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫ দশমিক ১ শতাংশ।

চিত্র ২.৮: নবম হতে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রধান কার্যক্রমসমূহে ব্যয়িত সময়ের তুলনামূলক হার (শতাংশ)[৫৩]

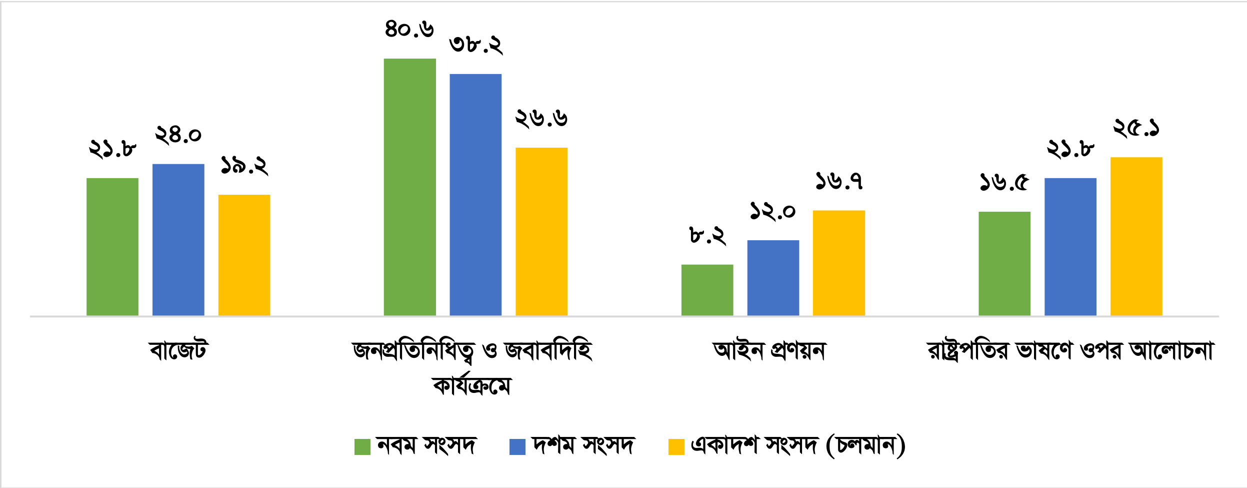

এখানে লক্ষণীয়, বাজেট আলোচনা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৫২] অষ্টম জাতীয় সংসদের পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে তুলনা করা সম্ভব হয়নি।

[৫৩] এখানে উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের সময় হিসাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতির দেওয়া ভাষণের সময় অন্তর্ভুক্ত নয়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা

সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর ৭৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকেন[৫৪]।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়সমূহ ও ব্যয়িত সময়

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোট পাঁচবার ভাষণ প্রদান করেন। এই নিয়মানুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন এবং ২০১৯ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হিসেবে সংসদের ১ম অধিবেশনে, ২০২০ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হিসেবে সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে, ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হিসেবে সংসদের ১১তম অধিবেশনে, ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হিসেবে সংসদের ১৬তম অধিবেশনে এবং ২০২৩ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হিসেবে সংসদের ২১তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০ম অধিবেশনের ২য় কার্যদিবসে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১৫তম অধিবেশনের ৬ষ্ঠ কার্যদিবসে এবং জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২২তম অধিবেশনের ২য় কার্যদিবসে ভাষণ প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনা ও প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। অধিবেশনের সূচনায় ৫টি কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতি মোট ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট ভাষণ প্রদান করেন যা সংসদের কার্যক্রম শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ সময়।

সারণী ৩.১: একাদশ সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ (১ম-২২তম)

অধিবেশন	বৈঠক	ব্যয়িত সময়
১ম	১ম	১ ঘণ্টা ০৪ মিনিট
৬ষ্ঠ	১ম	১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট
১১তম	১ম	১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট
১৬তম	১ম	০ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
২১তম	১ম	০ ঘণ্টা ৩১ মিনিট
মোট		৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট

সংসদ অধিবেশনে মৌখিকভাবে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করলে তার বক্তব্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিক ভাবে মোটাদাগে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এবং প্রারম্ভিক বক্তব্য; বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিষয়ক আলোচনা; সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনা; ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা বিষয়ক বক্তব্য এবং অন্যান্য বক্তব্য। শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এবং প্রারম্ভিক বক্তব্যে যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন, নববর্ষের শুভেচ্ছা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্মরণ, চারনেতাসহ অন্যান্য নেতাদের স্মরণ, ১৫ আগস্টে নিহতদেরকে স্মরণ, মরহুম সংসদ সদস্যদেরকে স্মরণ, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহত ও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিষয়ক আলোচনায় যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব, অবদান ও অনুসরণীয় দর্শন, মুজিববর্ষ উৎযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, করোনার কারণে মুজিববর্ষের মেয়াদ বর্ধিতকরণ, করোনার প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাড়ম্বরে মুজিববর্ষ উৎযাপন ইত্যাদি।

সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনায় যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় কার্যকর, জিরো টলারেন্স নীতি, বিভিন্ন রূপকল্প ও এসডিজি বাস্তবায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জন, উন্নয়নমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মেগা প্রকল্প, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে সফলতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন, সফল ভাবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ইত্যাদি। ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা বিষয়ক বক্তব্যে যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো সংসদে ঐক্যমত্য গঠনের আহ্বান, সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকে গঠনমূলক ভূমিকা পালন, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি তৈরি,

[৫৪] বিস্তারিত দেখুন, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৩ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ৩৩-৪০।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সতর্কতা অবলম্বন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে অধিক কার্যকর করা, ধর্মের নামে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না করা ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়ে যে আলোচনাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো হলো স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকী বিষয়ক আলোচনা, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা ইত্যাদি।

১ম হতে ২২তম অধিবেশনে মৌখিকভাবে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ হতে দেখা যায়, ভাষণে মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ (২০ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড) সময় ব্যয়িত হয়েছে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এবং প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করতে, ৪ দশমিক ৩ শতাংশ (১২ মিনিট ১৬ সেকেন্ড) সময় ব্যয়িত হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিষয়ক আলোচনায়, ৭৮ দশমিক ৭ শতাংশ (৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড) সময় ব্যয়িত হয়েছে সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনায়, ৪ দশমিক ৩ শতাংশ (১২ মিনিট ২৫ সেকেন্ড) সময় ব্যয়িত হয়েছে ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা বিষয়ক আলোচনায় এবং ৫ দশমিক ৩ শতাংশ (১৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ড) সময় ব্যয়িত হয়েছে অন্যান্য আলোচনায়।

চিত্র ৩.১: রাষ্ট্রপতির ভাষণে বিষয়কভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

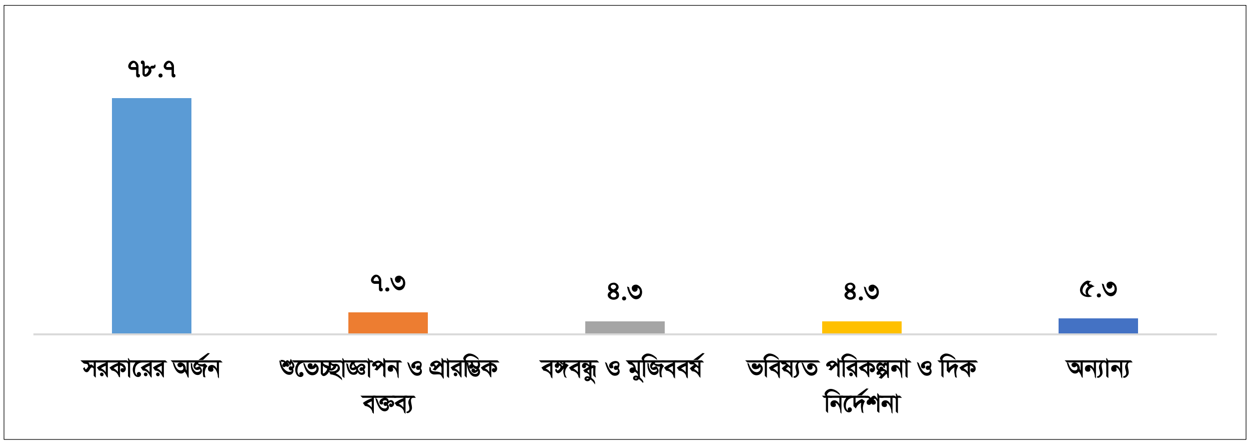

রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় চার পঞ্চমাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে এ বিষয়ক আলোচনায়। দেশের সার্বিক অবস্থার চিত্র রাষ্ট্রপতির ভাষণে ফুটে উঠেনি। ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনার বিষয়ক আলোচনাও আলাদা ভাবে কোন গুরুত্ব পায়নি। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ ভাবে কিছু দিকনির্দেশনা ও আহ্বান থাকলেও দেশের অগ্রগতির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দিকনির্দেশনা এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা কার্যক্রম পরিচালনায় একাদশ জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনের ৫টি অধিবেশনে মোট ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সংসদ কার্যক্রমের ২৫.১% সময়। ৫টি অধিবেশনের মোট ৮৬টি কার্যদিবসে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ১ম অধিবেশনে মোট ২৫ দিন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে সংসদ সদস্যরা মোট ৫২ ঘণ্টা ৬ মিনিট আলোচনা করেন, ৬ষ্ঠ অধিবেশনের ২৪টি কার্যদিবসে ৫৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, ১১তম অধিবেশনে ১১টি কার্যদিবসে মোট ২৫ ঘণ্টা ০২ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, ১৬তম অধিবেশনের ৪টি কার্যদিবসে ৮ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২১তম অধিবেশনের ৪০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সারণী ৩.২: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়

অধিবেশন	কার্যদিবস	ব্যয়িত সময়
প্রথম	২৫	৫২ ঘণ্টা ০৬ মিনিট
ষষ্ঠ	২৪	৫৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট
একাদশ	১১	২৫ ঘণ্টা ০২ মিনিট
ষোড়শ	৪	৮ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট
একবিংশ	২২	৪০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট
মোট	৮৬	১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট

৫টি অধিবেশনে মোট ২৯০ জন (৮২.৮%) সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে পুরুষ সদস্য ছিলেন মোট ২২৩ জন (৭৬.৯%) এবং নারী সদস্য ছিলেন মোট ৬৭ জন (২৩.১%) যাদের মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন ২০ জন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন মোট ৪৭ জন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বিভিন্ন দলের সদস্যরা মোট ১৮১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ব্যয় করেন। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যদের ব্যয়িত সময় মোট ১৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৬.২%), প্রধান বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ২০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১.২%) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট (২.৬%)। এক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের মোট ব্যয়িত /সময় ১৪১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (৭৭.৮%) এবং নারী সদস্যদের ব্যয়িত সময় ৪০ ঘণ্টা ১৬ মিনিট (২২.২%) যার মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্যদের ব্যয়িত সময় ১৪ ঘণ্টা ২৩ মিনিট (৩৫.৭%) এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ব্যয়িত সময় ২৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট (৬৪.৩%)।

দলভেদে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সরকারি দলের সদস্য ছিলেন মোট ২৫৯ জন (৮৯.৩%) যাদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ১৯৯ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ৬০ জন, যাদের মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন ১৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন মোট ৪২ জন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন মোট ২৩ জন (৭.৯%) যাদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ১৭ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ৬ জন যাদের মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন ২ জন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন মোট ৪ জন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন মোট ৮ জন (২.৮%) যাদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ৭ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ১ জন যিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য।

চিত্র ৩.২: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

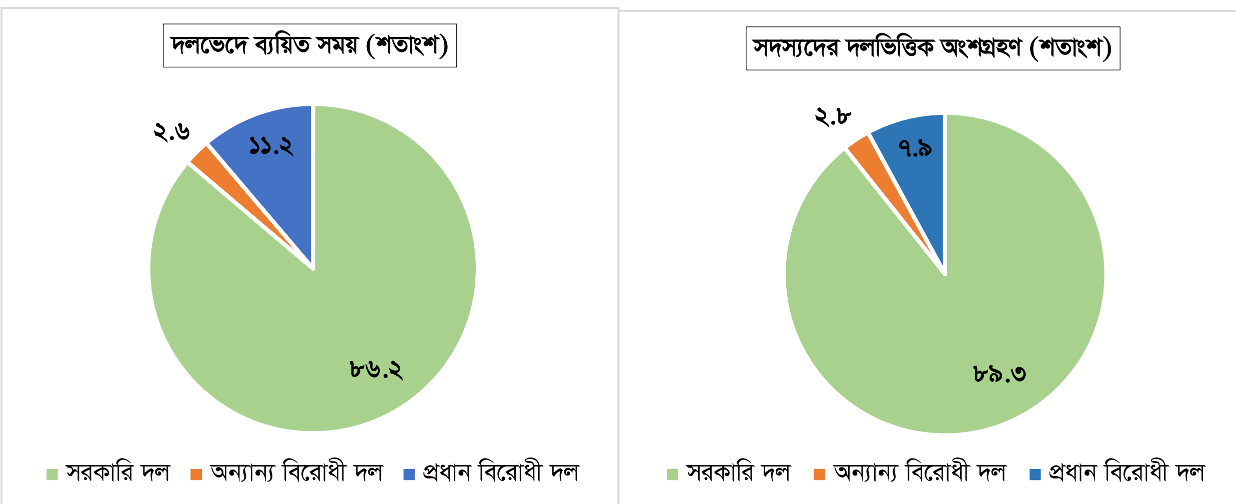

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্য

সরকারি দলের সদস্যরা সর্বনিম্ন ৩ মিনিট হতে সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট পর্যন্ত সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এবং সরকারের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসায়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্যয়িত সময় যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ ও ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ। ৮০ শতাংশেরও অধিক বক্তার বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রশংসা। এক্ষেত্রে বক্তাগণ গড়ে তাদের ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৭০ শতাংশ সময়ই ব্যয় করেন এই প্রসঙ্গে।

চিত্র ৩.৩: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সরকারি দলের বিষয়কভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

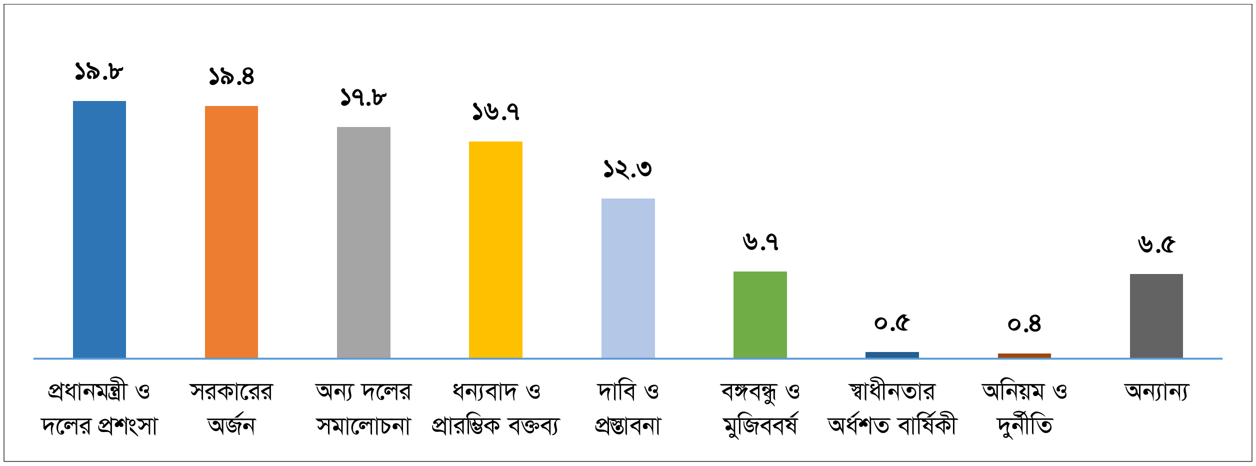

এরপরই সর্বোচ্চ সময় ব্যয়িত হয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের সমালোচনায়। ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয় এ বিষয়ক আলোচনায়। সরকারি দলের ৭০ শতাংশেরও অধিক বক্তা তাদের বক্তব্যে কোনো না কোনো ভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের মূলত বিএনপি ও জামায়াত দলের সমালোচনা করেন। কোনো কোনো বক্তার ক্ষেত্রে সমালোচনার এই সময় ১৭ মিনিটেরও বেশি ছিল। কেউ কেউ তাদের বক্তব্যের ৮৮ শতাংশের বেশি সময়ই ব্যয় করেন অন্য দলের সমালোচনায়। বঙ্গবন্ধুর হত্যা চক্রান্ত হতে শুরু করে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতার সময় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা অপচেষ্টাসহ বিএনপির বিভিন্ন সমালোচনা উপস্থাপিত হয় বক্তাদের বক্তব্যে। দলের সদস্যদের নামের সাথে বিভিন্ন নেতিবাচক বিশেষণ যুক্ত করে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

> যেমন, জিয়াউর রহমানকে *খুনি জিয়া, ঘাতক জিয়া, বিশ্বাসঘাতক জিয়া, পাকিস্তানি পেতাত্মা, পাকিস্তানি এজেন্ট, পাকিস্তানি দোসর, কুখ্যাত মেজর জিয়া, ছদ্মবেশী, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খলনায়ক, বঙ্গবন্ধুর খুনী, ইত্যাদি;* বেগম খালেদা জিয়াকে *কুলাঙ্গার প্রধানমন্ত্রী, দুর্নীতিগ্রস্থ প্রধানমন্ত্রী, মুর্খ প্রধানমন্ত্রী, অগ্নিসন্ত্রাসী, আগুনসন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসের রাণী, এতিমের টাকা আত্মসাৎকারী, সন্ত্রাসী খালেদা, সন্দেহবাদী খালেদা জিয়া, দুর্নীতির বরপুত্রের জননী, মিথ্যাচারিনী, ইত্যাদি;* তারেক রহমানকে *খুনী, কুলাঙ্গার, খুনি জিয়ার পুত্র, চোর, ও জঙ্গিনেতা, বিশ্ব বেয়াদব, বেগম খালেদা জিয়ার দুষ্ট পুত্র, জগৎ কুখ্যাত লুটেরা, খালেদা জিয়ার কুখ্যাত সন্তান, ইতিহাসের মীরজাফরের পুত্র মিরনের মতো কুলাঙ্গার পুত্র তারেক, খালেদা জিয়ার কু সন্তান খুনি তারেক জিয়া, খুনি পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামী, দুর্নীতিবাজ, লস্কর, খুনির পুত্র খুনি তারেক, পলাতক কয়েদী, খাম্বা তারেক, দুর্নীতির বরপুত্র, দুর্নীতিতে অনার্স ও মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স* ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়।

বিএনপির একজন সদস্যকে উদ্দেশ্য করে সরকারি দলের একজন সদস্য তার বক্তব্যে বলেন,

> *“বিএনপির মহিলা এমপি, আপনার দলীয় ম্যাডাম খালেদা জিয়ার মতো চিৎকার চেচামেচি আর গলাবাজি করলেই কোনো অসত্য তথ্যকে বৈধতা দেয়া যায় না। রাজাকার ও রাষ্ট্রদ্রোহী পাকি প্রেমীদের সন্তান সর্বদা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশবিরোধী হয়। সংসদে আপনার অতিকথন এবং অসত্য তথ্য উপস্থাপন প্রথমদিন থেকেই। তিনি আসার পর থেকে কারচুপির নির্বাচন শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির ১ দলীয় কারচুপির নির্বাচন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি কারচুপির নির্বাচন কী, কাকে বলে, এবং কত প্রকার? ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নির্লজ্জ বেহায়াপনা তারা এর বাইরে ভাবতেও পারে না, বলতেও পারে না। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনাকারি এবং নির্দেশদাতা খুনি, চোর এবং জঙ্গি নেতা তারেক জিয়া আপনাকে মহান সংসদে পাঠিয়েছে সংসদকে অস্থিতিশীল করার জন্য- এটা আমরা দেশবাসী সকলেই অবগত রয়েছি। খুনি তারেকের বান্ধবী, আপনি নারী হয়ে নারীর ধর্ষকদের বিচার চান না, নারীর সম্ভ্রমের কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই। অবশ্য আপনার মতো একজন নির্লজ্জ বেহায়ার কাছ থেকে দেশের ৮ কোটি নারী সমাজ এর থেকে বেশি কিছু আশা করে না। মাননীয় সংসদ সদস্য, ম্যাডাম জিয়ার দিন শুরু হতো সন্ধ্যার পর মদিরা হাতে, সারারাত তিনি সাজগোজ আর ড্রিংক নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর সারাদিন তিনি ঘুমাতেন। মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার কাছে আমার প্রশ্ন- আপনার ম্যাডাম ৫ এবং ৫ ইয়্কুয়াল টু ১০ বছরের সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা কে বা কারা করত? তিনি তো ঘুমিয়েই কাটাতেন। যেই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর এই দুরবস্থা সেই সরকার দেশকে যে কিছু দিতে পারে না সেটাই স্বাভাবিক এবং বাস্তবতা। সেই দলের কর্মী হয়ে আপনার মুখে এসব কথা শোভা পাবেই।”*

সরকারি দলের আরেকজন সদস্য বলেন,

> *"বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রী টাকা আত্মসাৎ করে জেলে যায় নাই। একমাত্র কুলাঙ্গার ইতিহাস একজন প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছে এই বাংলাদেশে, তার নাম বেগম জিয়া। আমি তীব্র নিন্দা জানাই- একটা দলের প্রধান, যিনি চেয়ারম্যান, যিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এতিমের টাকা আত্মসাৎ করে যিনি কারাদন্ড প্রাপ্ত, কারাভোগী আসামী তাকে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি কীভাবে করে? আর তার পুত্র সেই তারেক রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির কুলাঙ্গার-কুপুত্র। এই বাংলাদেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা, আমার বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সকল জাতীয় নেতাকে একসাথে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেই মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী আজকে পলাতক বিদেশে। সেই খুনি জিয়ার পুত্র ওই তারেক রহমান আজকে ওখানে বসে স্কাইপিতে এই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ওরা বলে জাতীয়তাবাদের বাবার নাম নাকি জিয়াউর রহমান। আমি ধিক্কার জানাই, আমি তীব্র নিন্দা জানাই! এই কুলাঙ্গার তারেক রহমান নতুন পিতা তৈরি করতে চায় খুনি জিয়াউর রহমানকে। এই বাংলাদেশের রাজনীতি ধ্বংসকারী, এই বাংলাদেশের ইতিহাস বিনষ্টকারী, যুদ্ধাপরাধী সেই গোলাম আযমকে বাংলাদেশে এনে নিজে রাষ্ট্রপতি হয়ে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের মতো কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে, মাওলানা মান্নানদেরকে- যুদ্ধাপরাধীদেরকে যারা মন্ত্রীসভায় ঠাঁই দিয়ে বাংলার ইতিহাসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই দল বিএনপি- তাদের জনকের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাই।"*

বিএনপির পাশাপাশি জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদের সমালোচনাও ফুটে উঠে সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যে। সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য বলেন,

> *"বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে, চোখ তুলে নিয়েছে, হাতুর দিয়ে পিটিয়েছে, খুন করেছে- কী না করেছে! এমনকি জেনারেল এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় থাকতেও আমাদের ওপর কম অত্যাচার হয়নি, বহু নেতাকে গ্রেফতার করেছে, নির্যাতন করেছে। যখনই যারা ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামীলীগের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করেছে"*।

আরেকজন বলেন,

> *"এরশাদ সাহেব গুরুমারা শিষ্য- জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ছিল এরশাদ। তারে বানাল সেনাপ্রধান। জিয়া মরার পরেই ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাষ্ট্রপতি হলাম বলে হয়ে গেল"*।

ধন্যবাদজ্ঞাপন এবং প্রারম্ভিক বক্তব্যে ব্যয়িত হয়েছে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ সময়। কোনো কোনো বক্তা সর্বোচ্চ ৫ থেকে ৮ মিনিট পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছেন এই অংশে। এরপরেই সর্বোচ্চ সময় ব্যয়িত হয়েছে বক্তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও প্রস্তবনা উপস্থাপনে। এই বিষয়ক বক্তব্যে ব্যয়িত হয় মোট ১২ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার অভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি, টেকসই উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, সরকারের জন্য গঠনমূলক পরামর্শের বিষয়গুলো সরকারি দলের বক্তাদের আলোচনায় তেমন একটা প্রাধান্য পায়নি। মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ বক্তা তাদের বক্তব্যে টেকসই উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছে। তবে সেক্ষেত্রেও টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য ছিল খুবই গড়পড়তা এবং নাতিদীর্ঘ (গড়ে ১৬ সেকেন্ড)। টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার কাজ করছে বা সে লক্ষ্যে আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে এই ধরনের বক্তব্য দিয়েই এই প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা শেষ করেছেন। নারী উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছেন ০ দশমিক ৩ শতাংশ বক্তা এবং এই প্রসঙ্গে তাদের গড় ব্যয়িত সময় ছিল ১ মিনিটেরও কম সময়। চলমান বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং দলের সদস্যদের সমালোচনা বিষয়ক বক্তব্য রেখেছেন শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বক্তা, এই প্রসঙ্গে তাদের গড় ব্যয়িত সময় ছিল ২ মিনিটের মতো। তবে এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে "জয় বাংলা" ব্যবহার না করা নিয়ে দলের সদস্যদের প্রতি একজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

> *"...হাইকোর্ট থেকে একটা আদেশ হয়েছে বক্তৃতা দেওয়ার শেষে জয় বাংলা বলার জন্য। কোন আমলারাই জয় বাংলা বলে না। আওয়ামী লীগের অনেকে লোকেরা জয় বাংলা বলে না। তারা বলে দীর্ঘজীবি হোক। যেখানে আমরা জয় বাংলা বলে অস্ত্র ধরেছিলাম, জয় বাংলা বলে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম সেখানে জয় বাংলা বলতে কেন এতো লজ্জাবোধ হয় আপনাদের। অনেক আওয়ামীলীগের লোকেদেরকে বলতে দেখি দীর্ঘজীবি হোক, কেন জয় বাংলা বললে কি মুখ থেকে গন্ধ বের হইবো? তাই আমি আওয়ামীলীগের এমপি সাহেবদের বলতে চাই আপনার দয়া করে আর দীর্ঘজীবি হোক বইলেন না, দয়া করে বলবেন জয় বাংলা। জয় বাংলা না বললে বোঝা যাবে দুই নম্বর আওয়ামী লীগ..."*।

অন্যান্য বিভিন্ন আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে যার মধ্যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি প্রশংসা ও তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য শুভকামনাজ্ঞাপনসহ অন্যান্য বিভিন্ন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্য

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা সর্বনিম্ন ৬ মিনিট হতে সর্বোচ্চ ৩২ মিনিট পর্যন্ত সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে দেশের চলমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তবনা প্রদানে। মোট ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে এ বিষয়ক আলোচনায়। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সংকটসহ সমসাময়িক বিভিন্ন পরিস্থিতির পর্যালোচনাসহ সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রস্তাবনা প্রদান করেন। ৬৬.৭% বক্তার বক্তব্যতেই কোনো না কোনো ভাবে এই বিষয়টি উঠে আসে। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ সময়। ৫৯ দশমিক শূন্য শতাংশ বক্তাই তাদের বক্তব্যে সরকারের বিভিন্ন অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। সরকার ও প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ সময়। যার মধ্যে সরকারের সমালোচনায় ব্যয় হয় ৬ দশমিক শূন্য শতাংশ। মোট বক্তাদের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশের বক্তব্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বা পদক্ষেপ বা সরকারি দলের সদস্যদের সমালোচনা উত্থাপিত হয়।

চিত্র ৩.৪: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধান বিরোধী দলের বিষয়কভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

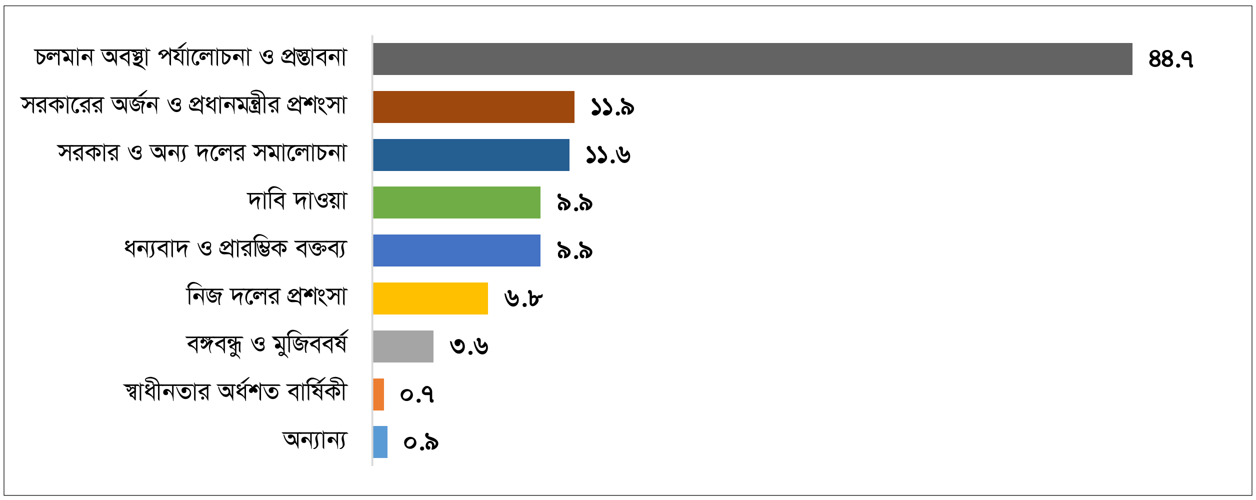

অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য তার বক্তব্যে বলেন,

> *"...মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই সংসদে দাবি করেছিলেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী, উনার শ্রেষ্ঠত্বের জায়গাটি কোনটি মাননীয় স্পিকার সেটি আমরা এখনো বুঝে পাই না। অর্থনৈতিক সেমিনারে বলা হচ্ছে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে মাননীয় স্পিকার আর আমাদের অর্থমন্ত্রী বলছেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী। যেই দেশ থেকে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যায় সেই দেশের অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেকে সংসদে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী দাবি করছেন মাননীয় স্পিকার, যদি ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয় তাহলে অবশ্যই তিনি শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার, সরকারের ধার ছয় মাসেই আমাদের জাতীয় সংসদে যে বাজেট পাস হয়েছিল বিগত বাজেট, সেখানে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার জন্য সরকার একটা সম্ভাব্য টার্গেট করেছিল, অর্থমন্ত্রী সেখানে বলেছিলেন কি পরিমান ঋণ সরকার ব্যাংক থেকে নিতে পারেন, কিন্তু সেই ঋণ ছয় মাসেই একবছরের পুরো ঋণ নিয়ে গেছেন মাননীয় স্পিকার, এটি হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠত্ব, ১০ বছরে সরকার ব্যাংক ঋণ নিয়েছে ২ লাখ কোটি টাকা মাননীয় স্পিকার, এবং ব্যাংক থকে উনার যে ঋণের টার্গেট সে সেটি নিয়ে যাওয়ার পরে এখন একটি আইন এ সংসদে নিয়ে আসছেন কয়েকদিন আগে, আমরা বিরোধীতা করার পরেও সেই আইন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস হয়েছে মাননীয় স্পিকার, সেটি হচ্ছে ৬১টি সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে বাধ্য করার জন্যে কয়েকদিন আগে তিনি আইন করে নিয়ে গেছেন এইখান থেকে, এখন এই ৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের যে উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে, আয় রয়েছে সেই আয় তিনি এখন নিয়ে যাবেন, ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছেন এক বছরেরটা ছয় মাসে, এখন আর নেওয়ার জায়গা পাচ্ছেন না, এখন এই ৬১টি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয় উনি নিয়ে যাবেন, এ নিয়ে উনি শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী হবেন মাননীয় স্পিকার..."*।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এ দলের বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোন নতুনত্ব নেই। এখানে শুধু সরকারের উন্নয়ন ফিরিস্তিই প্রাধান্য পেয়েছে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা, উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত কোন নির্দেশনার চিত্র ফুটে উঠেনি। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণে মূলত সরকারের বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে। সরকার সাফল্যের চিত্র দেখাতে চায়

তাই রাষ্ট্রপতির ভাষণে সেটাই ফুটে উঠে, ব্যর্থতার চিত্র প্রকাশ পায়নি। এছাড়াও দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রধানবিরোধী দলের ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়ণ না করার প্রসঙ্গে একজন বক্তা তার বক্তব্যে বলেন,

> *"সরকারের যত কৃতিত্ব এর পিছনে জাতীয় পার্টির একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু, আওয়ামীলীগের কোন নেতা একবারও আমাদের নাম উচ্চারণ করে না। আমরা কিন্তু হাজার বার উচ্চারণ করি যে এই সরকারের আমলে এটা হইছে। আমাদের সেটা আছে, তাদের সেটা নাই। এতো কার্পণ্য কেন রাজনীতিতে! এটা গণতন্ত্রের ভাষা না..."*।

নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন দাবি দাওয়া উপস্থাপনে ব্যয়িত হয় ৯ দশমিক ৯ শতাংশ সময়। নিজ দলের এবং নেতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় ব্যয়িত হয় ৬ দশমিক ৮ শতাংশ সময়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিষয়ক আলোচনা, স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকী বিষয়ক আলোচনা এবং অন্যান্য আলোচনায় ব্যয়িত হয় যথাক্রমে ৩ দশমিক ৬, শূন্য দশমিক ৭ এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ সময়। প্রায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশের মত সময় ব্যয়িত হয় নারী উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায়। নারী বিষয়ক আলোচনায় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিষয়টি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি এখানে ফুটে উঠেনি। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রেও গড়পড়তা ভাবে দুর্নীতি বা অনিয়ম রোধ না করা হলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না এই ধরনের বক্তব্য উঠে আসে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্য

অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা সর্বনিম্ন সাড়ে তিন মিনিট হতে সর্বোচ্চ সাড়ে ২০ মিনিট পর্যন্ত সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে সমালোচনায়। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভূমিকা, নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, স্পিকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনায় ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সদস্যদের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়িত সময়ের ৮৯ শতাংশই ব্যয় হয়েছে সমালোচনায়। লক্ষ্য করা যায় এ দলের কিছু কিছু বক্তা তাদের বক্তব্য প্রদানের মোট সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ সময়ই সমালোচনায় ব্যয় করেছেন। এছাড়া অন্যান্য দলসমূহের (গণফোরাম ও স্বতন্ত্র) গড়ে ৩৫ শতাংশের মত সময় ব্যয় করেছে সমালোচনার ক্ষেত্রে।

চিত্র ৩.৫: রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অন্যান্য বিরোধী দলের বিষয়কভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

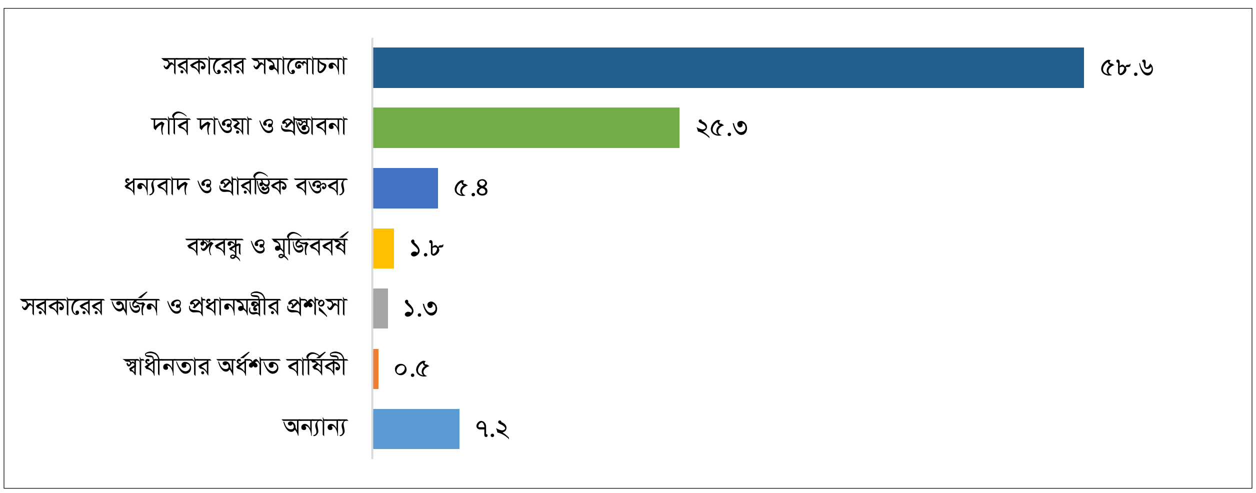

রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে প্রধান বিরোধী দলের মতো অন্যান্য বিরোধী দলের বক্তরাও বলেন, রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে সরকারের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করছে, যা কাম্য নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...রাষ্ট্রপতি অনেক ভালো বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু, অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে চাই, একটি দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি দলীয় বক্তব্য দিয়ে জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ সরকারদলীয় পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। কেবলমাত্র সরকারের গুণগান গেয়েছেন যা কাম্য ছিল না..."*।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সরকারের প্রচারিত উন্নয়নের চিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, সরকার উন্নয়নের যে চিত্র প্রচার করছে তা মূলত ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের একটি কৌশলগত প্রপাগান্ডা। সরকার উন্নয়নের চিত্র দেখিয়ে ব্যর্থতাকে ঢেকে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...বর্তমান সরকার তার ম্যান্ডেটবিহীন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দেশের চরম অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে বলে জোর প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, মাননীয় স্পিকার। ভাষণের ৪.১ অনুচ্ছেদে আমরা পাই আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন বিস্ময়। এই প্রোপাগাণ্ডাকে ভিত্তি দিতে তৈরি হয়েছে 'উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র' স্লোগান। যা ভাষণে আমরা পাই ১৫.১ অনুচ্ছেদে। এমন সময় মহামান্য রাষ্ট্রপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট সাফল্য দাবি করলেন মাননীয় স্পিকার যখন গত এক বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো ক্রমাগতভাবে খারাপ হতে হতে এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বিপদজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন ইকোনমিক ফোরাম রিপোর্টে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় বাংলাদেশ এখন ৯৫তম। অথচ এর আগের বছরে বাংলাদেশ ছিল আরো ৭ ধাপ ওপরে, ৮৮তম। দেশের সকল অর্থনীতিবিদরা দেশে একটি অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। কিন্তু, এটা নিয়ে এই ভাষণে কোনো দিকনির্দেশনা তো নেই-ই, এমন কি কোন স্বীকৃতিও নেই..."*।

অন্যান্য বিরোধী দলের আরেকজন বক্তা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> *"...আদিকালে একটা পুঁথি পড়েছিলাম ১২ লক্ষ বলদ, ১৩ লক্ষ গাই, বাছুর আছে কত লেখা-জোকা নাই। মাননীয় স্পিকার, ওই গরু যখন গোনার চিন্তা ভাবনা করে যায়া দেখে ওই গরুর গোয়ালঘরই নাই, মাননীয় স্পিকার। উন্নয়নের সমস্ত চিত্র দেখে ফেলেছি কিন্তু, হেরি নাই যাহা নিজ নয়নে বিশ্বাস করিও না গরুর রচনে..."*।

দেশের অগ্রগতি এবং পশ্চাৎপদতার সঠিক মূল্যায়ন না করে শুধু উন্নয়নকে ফুটিয়ে তুলে দেশের মানুষের সঠিক অবস্থা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে বক্তারা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...উপহাস এখন এদেশের মন্ত্রীদের নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে কৃষিমন্ত্রী বললেন, এখন মোটা চাল নাকি গরুতে খায় আর কুঁড়ে ঘর আছে খালি কবিতায়। মাননীয় মন্ত্রী যদি ২০২০, ২০২১ সালে খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা দিয়ে গুগলে সার্চ দেন উনি দেখবেন ঠিক কতগুলো খবর তাতে ভেসে ওঠে। করোনার পরে অর্ধেক মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে। কিছু টাকা কমে পাওয়ার জন্য মানুষ টিসিবি'র যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ায়- মন্ত্রীকে প্রশ্ন করি সেটা কি তার গরুর জন্য চাল কেনার জন্যে? একটা প্রবাদ আছে- ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই- সরকারের হয়েছে সেই অবস্থা। সাধারণ মানুষ যখন হিমশিম খাচ্ছে সরকারের মন্ত্রীরা তখন হাস্য-উপহাসে ব্যস্ত। এই উপহাস দারিদ্র ও সাংবিধানিক অধিকার লুণ্ঠন নিয়ে..."*।

বক্তাদের আলোচনার একটি বড় অংশজুড়েই নির্বাচনের যথাযথতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যদের বক্তব্যে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সার্বিকভাবে দেশের গণতান্ত্রিক চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং বিদ্যমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তারা প্রশ্ন করেন। এই প্রসঙ্গে এ দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, এইরকম হাজারো প্রমাণ রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও স্বচ্ছ রাজনীতি সম্পর্কে বিরাট প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে কার্যকর গণতন্ত্র আছে কিনা অতীতে এ প্রশ্ন বহুবার উঠে এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচন ও ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নির্বাচনের পর প্রশ্নটি আবারো উঠে এসেছে। একাদশ সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে এককথায় বলা যায় কর্তৃত্ববাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু নেই- এ নির্বাচনের মাধ্যমে তা শতভাগ প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওইসব নির্বাচনে পরাজিতদের কিছু অভিযোগ থাকলেও নির্বাচন সবার কাছে বৈধতা পেয়েছিল। দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে উল্টো পথে চলছে গণতন্ত্র। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব নয় তা আবার প্রমাণিত হলো। পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে কিনা। নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট'- এর প্রতিবেদন দিয়েছে। সেখানে গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। উপরন্তু বাংলাদেশকে যেভাবে আখ্যায়িত করেছে তা লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেক কিছু নির্ভর করে নির্বাচনের মান কতটা ভালো ও স্বচ্ছ হলো তার ওপর। জাতীয় নির্বাচনে সারাদেশে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি এবং রাতের বেলায় ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ যেকোনো সরকারের জন্য অস্বস্তিকর বিষয়। একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে কথিত লেভেল প্লেইং ফিল্ড গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের বিএনপি থেকে শুরু করে বিরোধী পক্ষের সব রাজনৈতিক দল, জোট এবং আন্তর্জাতিক মহলের প্রত্যাশা ও দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এরপর রাতের আধারে ব্যালট বোঝাই করে ক্ষমতা ধরে রাখার নজিরবিহীন তৎপরতা ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে..."*।

আরেকজন বক্তা তার বক্তব্যে বলেন সরকার মূলত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত মিথ্যা গণতন্ত্রের বুলি না আওরিয়ে নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করা। তিনি বলেন,

> "*... একনায়কতন্ত্র আর গণতন্ত্র দুটো পরস্পর বিরোধী। অতএব বর্তমান সরকারকে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলি বাদ দিয়ে অঘোষিত বাকশালি পন্থার পথ পরিহার করে সরাসরি বাকশাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক। নতুবা দেশের মালিক জনগণকে তার দেশটি ফিরিয়ে দিন, ফিরিয়ে দিন মানুষের অধিকার, ফিরিয়ে দিন মানুষের স্বাধীনতা। আজকে যখন আমরা বক্তব্য রাখছি- আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি কিন্তু জনগণ, আপনি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য শুনতে চায়। কিন্তু আমার দুঃখ আমার সহকর্মী যারা আজকে সংসদের সদস্য তারা অযথা হৈচৈ করছে, এটা গণতান্ত্রিক চর্চা নয় মাননীয় স্পীকার। আমি এখানে প্রথমবার আসিনি, ৫বার এই পার্লামেন্টে এসেছি। আমারও সিনিয়র এমপি রয়েছেন, তারাও এসেছেন। আপনাকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই এই প্র্যাকটিসটা আগে আমরা দেখিনি। এই যে ব্যাড প্রাক্টিস, আমি ৯৬-এ এমপি ছিলাম তখনও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখনও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা তখন কিন্তু আমরা এই প্র্যাক্টিস দেখিনি। এইবার এসে কী দেখলাম! যে আওয়ামীলীগের পলিটিক্সের ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে গেছে...*"।

এছাড়া বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও প্রস্তাবনায় ব্যয়িত হয়েছে মোট ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ সময় যেখানে বক্তাদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন, জাতীয় উন্নয়ন, দলের নেত্রীর মুক্তির প্রস্তাব (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের), দলীয় সমঝোতা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন অর্জন ও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসায় ব্যয়িত হয়েছে ১ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ বিষয়ক আলোচনা ও স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকী বিষয়ক আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে যথাক্রমে ১ দশমিক ৮ ও শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ সময়। অন্যান্য আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ সময়।

বিগত দুইটি সংসদ[৫৫] অর্থাৎ, নবম ও দশম জাতীয় সংসদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের হারে তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। নবম ও দশম জাতীয় সংসদে এ পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহনের হার ছিল ৮৫ শতাংশ করে যেখানে একাদশ সংসদেও তা প্রায় একই রকম রয়েছে, ৮৩ শতাংশ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন একাদশ সংসদে। ব্যয়িত সময়ের হার বিবেচনা করলে দেখা যায় এই পর্বে সংসদে ব্যয়িত সময়ের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবম ও দশম জাতীয় সংসদে এই পর্বে ব্যয়িত হয়েছে সংসদের কার্যক্রমের মোট ১৭ শতাংশ ও ২২ শতাংশ সময় যেখানে একাদশ জাতীয় সংসদে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ সময়।

[৫৫] অষ্টম জাতীয় সংসদের রাষ্ট্রপতির ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনা পর্বের পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে তুলনা করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতা প্রদত্ত হয় জাতীয় সংসদের মাধ্যমে। সংসদের আইন প্রণয়নের এই ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক অনুমোদিত। সংবিধানের ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত।[৫৬] সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হবে এবং তা সংসদ সদস্যদের কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা হলে তা চূড়ান্তভাবে আইন বলে গণ্য হবে।[৫৭] আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় মোট তিনটি ধাপ অতিক্রম করে একটি প্রস্তাব বিল আকারে পাস হয়ে আইনে পরিণত হয়। এই ধাপগুলো হচ্ছে প্রাক লেজিসলেটিভ পর্যায় (বিলের খসড়া প্রণয়ন, নীতি উন্নয়ন ও মন্ত্রীসভার অনুমোদন), লেজিসলেটিভ পর্যায় (বিল সংসদে উত্থাপন, বিলের শিরোনাম ঘোষণা, বিলের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা, বিল পাস করার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া) এবং পোস্ট লেজিসলেটিভ পর্যায় (রাষ্ট্রপতির সম্মতি)। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিল (খসড়া আইন) সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ, জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোনো সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিল সম্পর্কে সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেট প্রকাশ করা হয়। ধরন অনুযায়ী বিলের তিনটি প্রধান শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে, সাধারণ বিল, অর্থ বিল ও আর্থিক বিল। সাধারণ বিলের সাথে আর্থিক বিষয়গুলো সরাসরি সম্পর্কিত থাকে না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটে এই ধরনের বিল সংসদে পাস হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে বিলগুলো প্রবর্তনের জন্য মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় সেগুলো সরকারি বিল এবং যে বিলগুলো মন্ত্রী নন এমন সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় সেগুলো বেসরকারি বিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বেসরকারি বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হয় না। তবে আর্থিক বিল ও অর্থ বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব সুপারিশ প্রয়োজন হয়। এ অধ্যায়ে একাদশ সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের আইন প্রণয়ন কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়

একাদশ সংসদের প্রথম ২২টি অধিবেশনের মধ্যে মোট ২১টি অধিবেশনের ১২৩টি কার্যদিবসে আইন প্রণয়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম অধিবেশনে কোনো আইন প্রণয়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়নি। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ১২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যার মধ্যে মন্ত্রীগণ কর্তৃক বিল উত্থাপন হতে শুরু করে বিল পাস পর্যন্ত ব্যয়িত হয় ১১৭ ঘণ্টা ৬ মিনিট এবং প্রস্তাবিত বিলের যাচাই-বাছাইয়ের পর বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত হয় ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট।[৫৮] আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যয় হয়। ২২টি অধিবেশনের মধ্যে মোট চারটি অধিবেশনে (৩য়, ১০ম, ১৫তম ও ১৭তম অধিবেশন) আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। দুইটি অধিবেশনে (১২তম ও ২২তম অধিবেশন) আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে এক ঘণ্টারও কম সময় ব্যয় হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ভারতের ১৭তম লোকসভায়[৫৯] আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমের মোট ৪৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডস-এ প্রায় ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয় হয়েছে।[৬০]

১ম হতে ২২তম অধিবেশনে পাসকৃত বিলের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই বিলগুলো উত্থাপন, স্থায়ী কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট উপস্থাপন, বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীদের বক্তব্য প্রদানে ব্যয়িত সময় মিলে একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৭০ মিনিট ব্যয় হয়। পাসকৃত বিলসমূহের মধ্যে এক থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে কোনো বিল পাস হয়নি, ২১ থেকে ৪০ মিনিটে পাস হয়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ (৭টি) বিল, ৪১ থেকে ৬০ মিনিটে পাস হয়েছে ২৫ শতাংশ (২৪টি) বিল এবং ৬০ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় করে পাস হয়েছে ৬৭ দশমিক ৭ শতাংশ (৬৫টি) বিল। বিল পাসের সর্বনিম্ন সময় ছিল প্রায় ২৮ মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় ছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। সর্বনিম্ন সময়ে পাস হওয়া বিলটি ছিল "ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০২২" এবং সর্বোচ্চ সময় নিয়ে পাস হওয়া বিলটি ছিল "প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২"। এক্ষেত্রে, ২০১৯ সালে ভারতে ১৭তম লোকসভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীদের বক্তব্য মিলে প্রতিটি বিলে গড়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট[৬১] ব্যয় হয়।

[৫৬] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৬৫ দ্রষ্টব্য

[৫৭] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৮০ দ্রষ্টব্য

[৫৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৮

[৫৯] https://www.prsindia.org, viewed on 15 March, 2020

[৬০] House of Lords, "Statistics on Business and Membership: Session 2019-2021," UK Parliament, accessed [29.09.2023], https://bit.ly/3LITFXw .

[৬১] https://www.prsindia.org, viewed on 18 March, 2020

সারণি ৪.১: বিল পাসের ব্যয়িত সময় (শতকরা)

বিল পাসে ব্যয়িত সময়সীমা	বিলের সংখ্যা	শতকরা
১-২০ মিনিট	০	০
২১-৪০ মিনিট	৭	৭.৩
৪১-৬০ মিনিট	২৪	২৫.০
৬০ মিনিট হতো তদূর্ধ্ব	৬৫	৬৭.৭

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলভেদে প্রক্রিয়াগত সময়েরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। বিল উত্থাপন হতে শুরু করে স্থায়ী কমিটির যাচাই-বাছাই পরবর্তী রিপোর্ট প্রদান ও সংসদে পাস হয়ে গেজেট হতে সর্বনিম্ন একদিন হতে সর্বোচ্চ ৩৭৫ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছে। একক কার্যদিবসে সর্বনিম্ন সময়ে পাসকৃত বিল হচ্ছে "Bangladesh Bank (Amendment) Bill, 2020" এবং সর্বোচ্চ সময়ে পাসকৃত বিল হল "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল, ২০২২"। বিল দুইটি সংসদে পাস হতে যথাক্রমে ৩২ মিনিট ও ৯৩ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ২৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন যা মোট সদস্যের মাত্র ৬ দশমিক ৯ শতাংশ (বিল উত্থাপনকারী ব্যতীত)। যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিল ছয়জন (২৫ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিল ১২ জন (৫০ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিল ছয় জন (২৫ শতাংশ)। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ১৮ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ছয় জন যাদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ছিলেন একজন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য ছিলেন পাঁচজন। তবে বিল বিষয়ক বিভিন্ন আপত্তি উপস্থাপন এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বিরোধীদলের মাত্র ১১ জন সদস্য অংশগগ্রহণ করেন। অন্যদিকে সরকারি দলের ছয় জন সদস্য মাত্র দুইটি বিলের ক্ষেত্রে সংশোধনী এনে বক্তব্য রাখেন।

সারণি ৪.২: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ

দল	পুরুষ		নারী				মোট	শতকরা
			নির্বাচিত		সংরক্ষিত			
	মোট	শতকরা	মোট	শতকরা	মোট	শতকরা		
সরকারি দল	৪	২২.২	১	১০০	১	২০.০	৬	২৫.০
প্রধান বিরোধী দল	৯	৫০.০	০	০	৩	৬০.০	১২	৫০.০
অন্যান্য বিরোধী দল	৫	২৭.৮	০	০	১	২০.০	৬	২৫.০
মোট	১৮	১০০	১	১০০	৫	১০০	২৪	১০০

অন্যদিকে দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় সরকারি দলের সদস্যদের ১ দশমিক ৯ শতাংশ, বিরোধী দলের ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৫০ দশমিক শূন্য শতাংশ সদস্য এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। লিঙ্গভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় পুরুষ সদস্যের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং নারী সদস্যের ৮ দশমিক ২ শতাংশ এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

বিল উত্থাপন, বিলের ওপর আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ

বাজেট সম্পর্কিত ১২টি আইন ব্যতীত একাদশ সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ১০৮টি বিল উত্থাপিত হয় এবং যার মধ্যে ৯৬টি[৬২] বিল পাস হয়[৬৩], বাকিগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। পাসকৃত বিলের মধ্যে ২৫টি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে আপত্তি জানানো হয় আর এতে অংশগ্রহণ করে প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের একজন করে মোট দুজন সদস্য। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপত্তিগুলো নাকচ হয়ে যায়। মোট ব্যয়িত সময়ের ৭ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে বিল উত্থাপন থেকে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ পর্যন্ত।

কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন

বিল স্থায়ী কমিটিতে যাচাই-বাছাই এর জন্য প্রেরণ থেকে সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন একদিন হতে সর্বোচ্চ ৯৭ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছে। কিছু বিলের ক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সময়সীমা বারবার বৃদ্ধি করার ফলে বিল পাসের সময় আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কমিটি হতে রিপোর্ট প্রদানের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রেও কোনো কারণ দর্শানো হয় না। কিছু বিলের ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধির এই হার চারবার পর্যন্ত হয়ে থাকে। "পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ বিল, ২০২২" বিলটি ২৮ শে মার্চ ২০২২ এ অনুষ্ঠিত ১৭ তম অধিবেশনে

[৬২] এছাড়া ২৩ তম অধিবেশনে আরও ১১টি এবং ২৪ তম অধিবেশনে ১৮টি বিল পাস হয়

[৬৩] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ৯ ও পরিশিষ্ট ১০

এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এরপর ২২ তম অধিবেশন পর্যন্ত চারদফায় মোট ৩৬০ দিন সময় বৃদ্ধি পেয়ে তা স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান ছিল। প্রতিবেদন উপস্থাপনে মোট সময়ের প্রায় ৫ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয় হয়।

জনমত যাচাই-বাছাই এবং সংশোধনী প্রস্তাব

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের মোট সময়ের প্রায় ৮৭ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয় সংসদ সদস্যদের বিল বিষয়ক বিভিন্ন আপত্তি উপস্থাপন এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করার জন্য। পাস হওয়া ৯৬টি বিলের (বাজেট সম্পর্কিত ১২টি আইন ব্যতীত) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যাচাই-বাছাই ও জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেন ১৮ জন (৫.১ শতাংশ) যেখানে প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন ১২ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন ছয়জন। পুরুষ ছিলেন ১৪ জন এবং নারী ছিলেন চারজন, যারা সবাই সংরক্ষিত আসনের সদস্য। ৯৬টি বিলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৯টি বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব করেন প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য। অন্যান্য বিরোধী দলের একজন নারী সদস্য সর্বোচ্চ ৭২টি বিলের ওপর জনমত যাচাই প্রস্তাব করেন। বিলের ওপর দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব করেন ২১ জন (৬.০ শতাংশ) সদস্য, যাদের মধ্যে সরকারি দলের ছয়জন, প্রধান বিরোধী দলের আটজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সাতজন ছিলেন। পাঁচজন নারী সদস্য বিভিন্ন বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব করেন যাদের চারজন ছিলেন সংরক্ষিত আসনের সদস্য।

৫০টি (৫২ শতাংশ) বিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনী ছাড়াই পাস হয়। "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল, ২০২০"- এর ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবকারী সবাই সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করে বিলটি প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। অবশিষ্ট ৪৫টি আইনের ক্ষেত্রে আংশিক সংশোধনী গৃহীত হয়। গৃহীত সংশোধনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সংশোধনীর ক্ষেত্রে ৬৭ শতাংশ ছিল বিভিন্ন দফা ও উপদফায় শব্দ সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপন বা বর্জন, যার মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশ ভাষাগত ত্রুটি সংশোধনের এবং বাকি প্রায় ২৮ শতাংশ ছিল বিভিন্ন বিষয় বা আওতা নির্দিষ্টকরণের অথবা বিভিন্ন ধারার নম্বরের সংশোধনের উদ্দেশ্যে। ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্যে ছিল "অস্বীকার করিতে" শব্দের পরিবর্তে "অস্বীকৃতি জানাতে", "প্রয়োজনীয় কর্মচারী" এর পরিবর্তে "প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী", "তথ্য"-এর পরিবর্তে "তথ্য উপাত্ত" ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করা। আর বিষয় বা আওতা নির্দিষ্টকরণের মধ্যে ছিল "১০ কার্যদিবস"- এর পরিবর্তে "১৫ কার্যদিবস", "ধারা ২২-এর অধীন"-এর পরিবর্তে "ধারা ২৩-এর অধীন" প্রতিস্থাপন, "গৃহীত ব্যবস্থা"-এরপর "লিখিতভাবে" সন্নিবেশ করা ইত্যাদি। গৃহীত সংশোধনীর অবশিষ্ট ৩৩ শতাংশ ছিল বিভিন্ন দফা/উপ-দফা/প্যারা সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপন।

চিত্র: ৪.১: গৃহীত সংশোধনীর ধরন

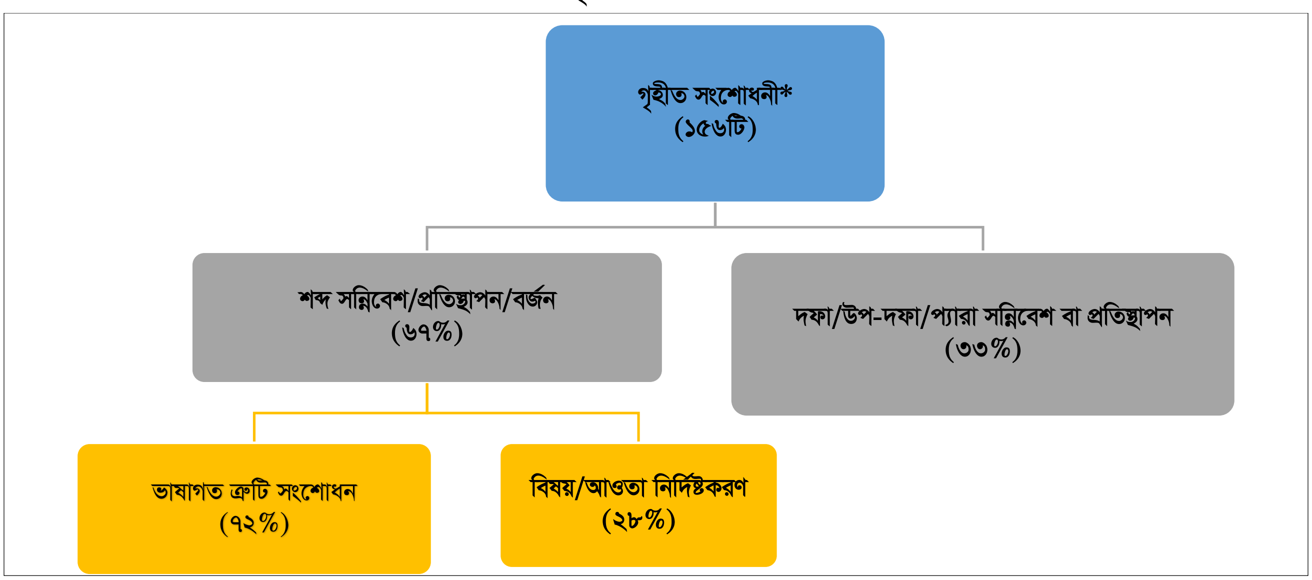

*একটি বিলের ওপর প্রদত্ত একই ধরনের সংশোধনী ১টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

টেবিলে উপস্থাপিত হওয়া অথবা সংশোধনীগুলো সংসদে উপস্থাপিত না হওয়ায় অনেক প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংখ্যা বা ধরন সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে যতগুলো উপস্থাপিত হয়েছে সেক্ষেত্রেও শব্দ সংযোজন, সন্নিবেশ বা বিভিন্ন বিষয়ে সংজ্ঞা সংযোজন প্রাধান্য পেয়েছে। তবে অনেকক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত সংশোধনীতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সেগুলো এড়িয়ে গিয়ে সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের আরেকজন সদস্য বলেন,

> "...সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সরকারের যেকোনো প্রস্তাবে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অটুট থাকে... সংশোধনগুলো গ্রহণ বা বর্জন সরকারের মর্জির ওপর নির্ভরশীল থাকে...।"[৬৪]

উদাহরণস্বরূপ সংসদে সর্বোচ্চ সময়ে পাস হওয়া নিম্নোক্ত বিলের ক্ষেত্রে গৃহীত ও উল্লেখযোগ্য অগৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ উল্লেখ করা হল।

সারণি ৪.৩: একটি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২	
গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	**উল্লেখযোগ্য অগৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ**
• বিভিন্ন দফা ও উপদফায় নির্বাচন কমিশনারের আগে "অন্যান্য" শব্দ সংযোজন • অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ১০ কার্যদিবসের পরিবর্তে ১৫ কার্যদিবস করা • "বিধি", "সদস্য", "আপিল বিভাগ" এবং "সংবিধান" শব্দসমূহ কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নির্দিষ্টকরণ • রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন নারী সদস্য রাখার প্রস্তাব	• অনুসন্ধান কমিটিতে সংসদ হতে সরকারি, প্রধান বিরোধী এবং ৩য় বৃহত্তম বিরোধী দল হতে একজন করে মোট তিনজন সদস্য রাখা • অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সদস্যদের নাম প্রকাশ করে জনমত যাচাই করা • নির্বাচন কমিশনারদের বয়স ৫০ বছরের পরিবর্তে ৪০ বছর এবং অভিজ্ঞতা ২০ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করা (শুধু আমলাদের জন্য পদ সৃষ্টি না করা) • মন্ত্রী পরিষদের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা • "দফা ৯" বর্জন করা যেখানে পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনারদের কাজকে জবাবদিহির আওতামুক্ত রাখা হয়েছে

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

পূর্ববর্তী সংসদের তুলনায় সংসদে সার্বিকভাবে বিল পাসে গড় ব্যয়িত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে বিল প্রতি ছয়জন এবং আটজন যথাক্রমে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব এনেছে, যদিও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সদস্যের মধ্যে যথোপযুক্ত ধারণার ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত, ঘুরেফিরে কয়েকজন সদস্য বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে আলোচনা করেছে, বাকিদের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল। দ্বিতীয়ত, নোটিশ দ্বারা আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য এবং তার প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর বিবৃতিতে সার্বিকভাবে সময় বৃদ্ধি পেলেও গাঠনিক বিতর্কের ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। এক্ষেত্রে একজন মুখ্যতথ্যদাতা বলেন,

> "...আইন পাসের ক্ষেত্রে মূলত প্রক্রিয়া অনুসরণই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আইন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ বা গঠনমূলক কোন বিতর্ক এক্ষেত্রে অনুপস্থিত..."

এছাড়াও বিলের ওপর বিরোধীদলসমূহ তাদের আপত্তি ও মতামত প্রকাশ করলেও দিনশেষে সমস্ত আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচ হয়ে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অধিকাংশ বিল পাস হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সরকারি দলের মতানুসারেই সংসদে বিল আনয়ন ও পাস হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের সার্বিক মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত মতামত গ্রহণ করার এই অনীহার প্রবণতা সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...আর মেজরিটির কারণে আলটিমেটলি সরকারি দল যা চায় যৌক্তিক হোক বা অযৌক্তিক হোক সেটাই সংসদে পাস হয়। একদিকে এটা অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক যে আমরা যা ইচ্ছা বলতে পারছি, যা সংশোধনী চাচ্ছি দিতে পারছি (বলতে পারছি)... আরেক দিকে এটা মোটেও অংশগ্রহণমূলক না, যেহেতু এণ্ড রেজাল্টে মেজরিটির (সরকারি দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা) কারণে সেটা বাদ হয়ে যাচ্ছে"।*

[৬৪] বিস্তারিত দেখুন, https://www.prothomalo.com/politics/v3aitld7od

অন্যদিকে নোটিশ খারিজ করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করায় নোটিশ প্রদানকারীদের একাংশকে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্থাপিত প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে বিরোধী দলের অতীত ইতিহাস, বিলের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্ট যাচাই-বাছাই পূর্বক বিলের প্রস্তাব উত্থাপিত ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিলের ওপর প্রদত্ত নোটিশসমূহ খারিজ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনে নোটিশ প্রদানকারী সদস্য কতৃক বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য আপত্তিসমূহ এবং তার প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া হল।

উল্লেখ্য যে, এই বিলের ক্ষেত্রে সকল সংশোধনী প্রস্তাবকারী সদস্যগণ তাদের প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ প্রত্যাহার করে বিল পাস না করার আহ্বান জানান (যা ইতোপূর্বে বর্ণিত) এবং যথারীতি এই বিলের ওপর আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবও নাকচ করে দেওয়া হয়।

সারণী ৪.৪: একটি বিলের ওপর আপত্তি প্রস্তাব

স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল, ২০২০	
বিল বিষয়ক উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য আপত্তিসমূহ	**আপত্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ**
• জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর লভ্যাংশ সরকার নিতে পারে না • ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্ট-২০১৫ এবং কোম্পানী অ্যাক্ট ১৯৬৯ এর সাথে সাংঘর্ষিক • রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবে • প্রতিষ্ঠানগুলোর টাকা সরকার নিয়ে গেলে তাদের শেয়ার বাজারের দাম পড়ে যাবে; পুঁজি বাজার ধ্বংস হয়ে যাবে • প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্বৃত্ত অর্থের পরিবর্তে পাচারকৃত অর্থ, শেয়ার বাজার, খেলাপী ঋণের অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো • এই আইন জনবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ও বিপদজনক। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ উঠিয়ে নিয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন	• ব্যাংক ও পুজিঁ বাজার প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কাজের সাথে তুলনা এবং ২০১০ সালের পর পুঁজিবাজারে উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যা না তৈরি হওয়ার দাবি • পূর্ববর্তী সরকারের একজন মন্ত্রীর সাথে তুলনা করে নিজেকে চলমান সময়ের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী দাবি • এই আইনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত বিধায় লাভজনক অবস্থায় তাদের অনিয়ন্ত্রিত অর্থ খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে • এই আইনের মাধ্যমে কিছু প্রতিষ্ঠানকে সরকারের তদারকির আওতাধীন করা যাবে • সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা না দিলে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আসবে না

মন্ত্রীর বিবৃতির পর সদস্যদের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো সুযোগ না থাকাটাও প্রকৃত বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। সদস্যরা অনেকক্ষেত্রে এক পর্বের প্রতিক্রিয়া অন্য পর্বে তাদের বক্তব্যে নিয়ে আসেন আবার কিছুক্ষেত্রে মন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন মাইক বন্ধ অবস্থায় চিৎকার করে প্রতিক্রিয়া জানান। বিভিন্ন আপত্তি বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে মন্ত্রীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"... অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক, অনেক ক্ষেত্রে রিলেভেন্ট না, পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের উত্থাপিত কনসার্নগুলো তারা এভয়েড করেন, প্রবলেম হলো তাদের বিবৃতির পর আমাদের রিপ্লাই দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এটা থাকলে ভালো..."*

আইন প্রণয়নে তুলনামূলকভাবে বিরোধীদলের ভূমিকা জোরালো হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও সরকারি দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল হতাশাজনক। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলের বিপক্ষে ভোট দিলে সদস্য পদ বাতিলের বিধান থাকলেও বিলের ওপর নোটিশ দিতে বাধা নাই। তবে এই অনুচ্ছেদের কারণে অথবা আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা থেকে পাস হয়ে আসা বিলের বিপক্ষে বলার ক্ষেত্রে সরকারি দলের সদস্যদের একটা মানসিক বাধা কাজ করতে পারে বলে মনে করেন কিছু বিশেষজ্ঞ ও সংসদ সদস্যরা। অন্যদিকে আইনের খসড়া প্রণয়নের পর থেকে নজর রাখা এর খুঁটিনাটি পড়া অনেক শ্রমসাধ্য বিধায় অনেকে এড়িয়ে চলেন বলেও মনে করা হয়।[৬৫]

[৬৫] বিস্তারিত দেখুন, 'সাংসদদের ভূমিকা: আইন প্রণয়ন কাজে অনাগ্রহ' দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি, ২০২০।

বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থবছরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা প্রত্যেক অর্থবছর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত।[৬৬] সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোনো সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ, বাজেট হচ্ছে দেশ পরিচালনা করতে একটি অর্থবছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের হিসাব যা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করে থাকে। প্রতি বছরের জুলাই হতে পরবর্তী বছরের জুন পর্যন্ত একটি অর্থ বছরের বাজেট প্রণীত হয়। মন্ত্রী সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের পর প্রতি বছর জুন মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রী বাজেট বিল পেশ করে থাকেন। এরপর অধিবেশনজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংসদ সদস্যদের আলোচনার পর ৩০ জুনের মধ্যে সংসদে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে বিলটি পাস হয়। সংসদ হতে বাজেট পাস হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করে তা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে মোট চারটি বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় অধিবেশনে একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম বাজেট (২০১৮-২০১৯ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১৯-২০২০ সালের বাজেট), ৮ম অধিবেশনে ২য় বাজেট (২০১৯-২০২০ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২০-২০২১ সালের বাজেট), ১৩তম অধিবেশনে ৩য় বাজেট (২০২০-২০২১ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২১-২০২২ সালের বাজেট) এবং ১৮তম অধিবেশনে ৪র্থ বাজেট (২০২১-২০২২ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ সালের বাজেট) উত্থাপন ও পাস হয়।

বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়

চারটি বাজেট অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৬২ দিন এবং মোট ব্যয়িত সময় ছিল ২৩৭ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় মোট ৪৪টি কার্যদিবসে এবং এক্ষেত্রে মোট ব্যয়িত সময় ১৪২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট যা বাজেট অধিবেশনে ব্যয়িত সময়ের ৬০ শতাংশ এবং একাদশ জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়িত সময়ের ১৯ দশমিক ২ শতাংশ। তৃতীয় অধিবেশনে বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয় ৫৮ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট, অষ্টম অধিবেশনে বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয় ১০ ঘণ্টা চার মিনিট, ত্রয়োদশ অধিবেশনে বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয় ২৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট এবং অষ্টাদশ অধিবেশনে বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয় ৪৯ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।

চারটি অধিবেশনে বাজেট (আগামী বছরের বাজেট ও চলতি বছরের সম্পূরক বাজেট) উপস্থাপনে ব্যয়িত হয় মোট পাঁচ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। চারটি বাজেট অধিবেশনেই অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল কর্তৃক বাজেট উপস্থাপিত হয়।[৬৭] বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মোট ১১৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট যার মধ্যে মূল বাজেটের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১০৪ ঘণ্টা নয় মিনিট এবং সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নয় ঘণ্টা এক মিনিট। মঞ্জুরি দাবির ওপর আলোচনায় ব্যয়িত হয় ২২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট যার মধ্যে মূল বাজেটের ওপর মঞ্জুরি দাবি উত্থাপনে ব্যয়িত হয় ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট এবং সম্পূরক বাজেটের ওপর মঞ্জুরি দাবি উত্থাপনে ব্যয়িত হয় ছয় ঘণ্টা ১৮ মিনিট।[৬৮]

চিত্র ৪.২: বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

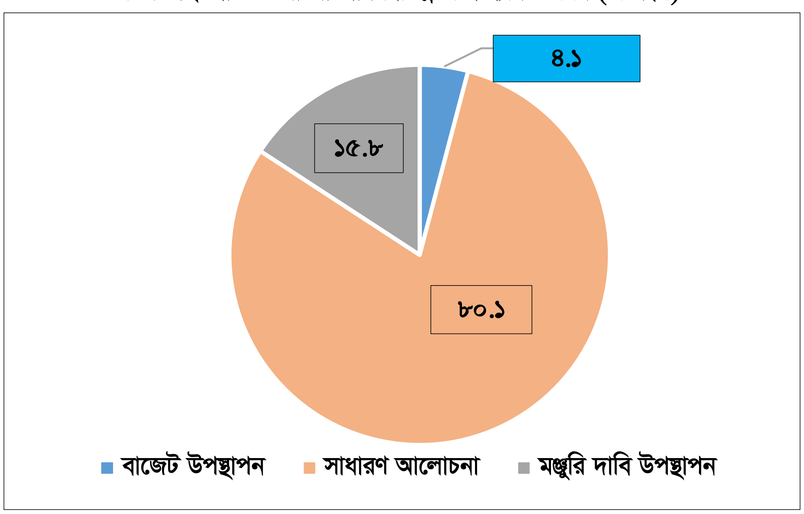

[৬৬] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৮৭ দ্রষ্টব্য।

[৬৭] ১ম বাজেট অধিবেশনে বাজেট উপস্থাপন করার সময় আ হ ম মুস্তফা কামাল ৫৫ মিনিট বাজেট উপস্থাপনের পর অসুস্থ হয়ে গেলে অবশিষ্ট বাজেট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উপস্থাপিত হয়।

[৬৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১১

চারটি অধিবেশনে অর্থবিল এবং নির্দিষ্টকরণ বিল (সম্পূরকসহ) উপস্থাপন ও পাস করার জন্য ব্যয়িত হয় সর্বমোট নয় ঘণ্টা চার মিনিট। ২০১৯, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ এই চারটি অর্থবিল পাস হতে মোট ব্যয় হয় আট ঘণ্টা ২৪ মিনিট। এর মধ্যে "অর্থবিল ২০১৯" পাস হতে সময় লাগে চার ঘণ্টা ছয় মিনিট এবং বাকি তিনটি অর্থবিল পাস হতে গড়ে এক ঘণ্টা ২১ মিনিট এর মতো সময় ব্যয় হয়। চারটি অধিবেশনে নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল এবং নির্দিষ্টকরণ বিল পাস হতে সময় লাগে যথাক্রমে ২০ মিনিট ও ২১ মিনিট। বিলগুলো পাস হতে গড়ে পাঁচ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হয়।

বাজেট আলোচনায় দলীয় অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে বাজেট আলোচনায় মোট ২৮৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিল ২৫৩ জন (৮৭.৯ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ২৪ জন (৮.৩ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন (৩.৮ শতাংশ)। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ২২৩ জন (৭৭.৪ শতাংশ) এবং নারী সদস্য ছিলেন ৬৫ জন (২২.৬ শতাংশ) যাদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য ছিলেন ১৯ জন (২৯.০ শতাংশ) এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য ছিলেন ৪৬ জন (৭১.০ শতাংশ)।

সারণি ৪.১: বাজেট আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ

দল	পুরুষ		নারী				মোট	শতকরা
			নির্বাচিত		সংরক্ষিত			
	মোট	শতকরা	মোট	শতকরা	মোট	শতকরা		
সরকারি দল	১৯৫	৮৭.৪	১৭	৮৯.৫	৪১	৮৯.১	২৫৩	৮৭.৯
প্রধান বিরোধী দল	১৮	৮.১	২	১০.৫	৪	৮.৭	২৪	৮.৩
অন্যান্য বিরোধী দল	১০	৪.৫	০	০	১	২.২	১১	৩.৮
মোট	২২৩	১০০	১৯	১০০	৪৬	১০০	২৮৮	১০০

মূল বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোট ২৮৮ জন সংসদ সদস্য যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ২৫৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ২৩ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ২২২ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ৬৬ জন (সরাসরি নির্বাচিত ২০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য ৪৬ জন)। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ছিলেন ২৫৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন ২৩ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন ১১ জন সদস্য। নারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ছিলেন ৫৯ জন (সরাসরি নির্বাচিত ২০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য ৪৬ জন), প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন ছয়জন (সরাসরি নির্বাচিত দুইজন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য চারজন) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন একজন সদস্য যিনি সংরক্ষিত আসন হতে নির্বাচিত।

সম্পূরক বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোট ২৭ জন সংসদ সদস্য যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ১৬ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন সাতজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন চারজন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ২১ জন এবং নারী সদস্য ছিলেন ছয়জন (সরাসরি নির্বাচিত তিনজন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য তিনজন)। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ছিলেন ১২ জন, প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন ছয়জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন তিনজন সদস্য। নারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ছিলেন চারজন (সরাসরি নির্বাচিত একজন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য তিনজন), প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন একজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন একজন সদস্য। প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল উভয় দল হতেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নারী ছিলেন সংরক্ষিত আসন হতে নির্বাচিত নারী সদস্য।[৬৯]

[৬৯] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১২

চিত্র ৪.৩: বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

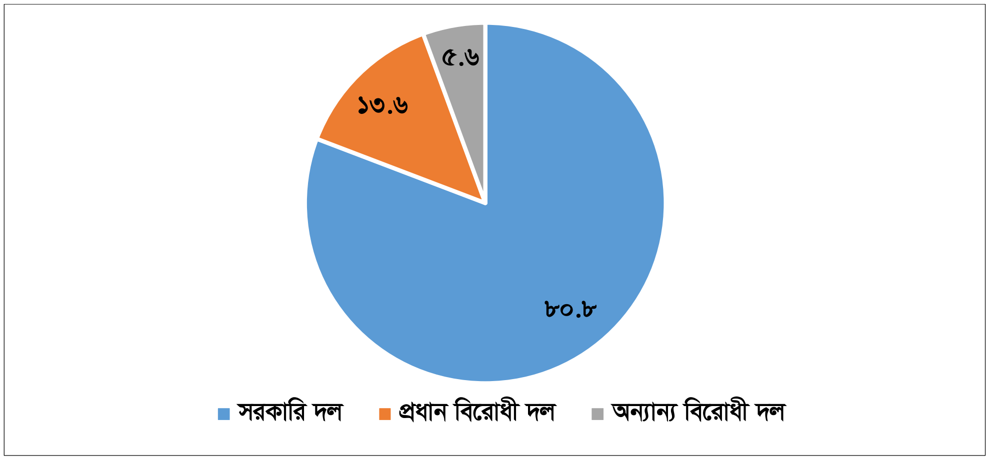

বাজেটের সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত ১১৩ ঘণ্টা ১০ মিনিটের মধ্যে সরকার দলের সদস্যদের আলোচনায় ব্যয়িত হয় মোট ৯১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট যা মোট আলোচনার ৮০ দশমিক ৮ শতাংশ সময়, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় ব্যয়িত হয় মোট ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট যা মোট আলোচনার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ সময় এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় ব্যয়িত হয় মোট ৬ ঘণ্টা ২৩ মিনিট যা মোট আলোচনার ৫ দশমিক ৬ শতাংশ সময়। এক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের মোট ব্যয়িত সময় ৮৭ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (৭৭.১% সময়) এবং নারী সদস্যদের মোট ব্যয়িত সময় ২৫ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট (২২.৯% সময়) যার মধ্যে নির্বাচিত আসনে নারী সদস্যদের ব্যয়িত সময় ১১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ব্যয়িত সময় ১৩ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট।

মূল বাজেট ও সম্পূরক বাজেটের ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ৪৪ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী কর্তৃক মোট ৩৩৯টি মঞ্জুরি দাবি উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে তিনজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী ব্যতীত বাকি ৪১ জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মধ্যে নারী ছিলেন চারজন এবং পুরুষ ছিলেন ৩৭ জন। নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত মঞ্জুরি দাবির সংখ্যা ৩৯টি এবং পুরুষ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত মঞ্জুরি দাবির সংখ্যা ৩০০টি। সম্পূরক বাজেটের ওপর ১০৩টি মঞ্জুরি দাবির ওপর ৮১২টি এবং মূল বাজেটের ওপর ২৩৬টি মঞ্জুরি দাবির ওপর ২২৩১টি ছাঁটাই প্রস্তাব দেওয়া হয়। ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ প্রদান করেন মোট ১৪ জন সংসদ সদস্য। যাদের মধ্যে প্রধান বিরোধীদলের সদস্য ছিল ১০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিল চারজন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিল নয়জন এবং নারী সদস্য ছিল একজন যিনি সংরক্ষিত আসনের সদস্য। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিল চারজন এবং নারী সদস্য ছিল একজন যিনি সংরক্ষিত আসনের সদস্য। ছাঁটাই প্রস্তাব প্রদানকারী ১৪ জন সদস্যের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের একজন পুরুষ সদস্য সকল কার্যদিবসেই অনুপস্থিত থাকায় তার কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। ৩৩৯টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ২৫ টি দাবির ওপর ১৩ জন সংসদ সদস্য তাদের আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ সংসদে আলোচনা করার সুযোগ পায়। সদস্যদের কর্তৃক আনীত সকল ছাঁটাই প্রস্তাব সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায় এবং উত্থাপিত সকল দাবি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক সরাসরি কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়।

চারটি অর্থ বিলের ওপর মোট ২৪ জন সংসদ সদস্য আপত্তি প্রস্তাব, জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আপত্তি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে "অর্থ বিল, ২০১৯" এর ওপর প্রধান বিরোধী দলের একজন পুরুষ সদস্য আপত্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা স্পিকার কর্তৃক নাকচ হয়ে যায়। এছাড়া বাকি তিনটি বিলে আর কোন আপত্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। চারটি বিলে মোট ১৩ জন সংসদ সদস্য জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিল আটজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিল পাঁচজন। প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ১১ জন যাদের মধ্যে সাতজন ছিলেন প্রধান বিরোধী দলের এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিল চারজন। প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল থেকে একজন করে নারী সদস্য ছিলেন যাদের উভয়েই সংরক্ষিত আসনের সদস্য। জনমত যাচাইয়ের সকল প্রস্তাবসমূহ কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য সরকারি দলের কোনো সদস্য জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। মোট ২৩ জন সংসদ সদস্য অর্থ বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়নকারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন আটজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন চারজন। সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন নয়জন ও নারী সদস্য ছিলেন দুইজন (একজন সরাসরি নির্বাচিত এবং একজন সংরক্ষিত আসনের সদস্য), প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে

পুরুষ সদস্য ছিলেন সাতজন ও সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্য ছিলেন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন তিনজন এবং সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্য ছিলেন ।[৭০]

চিত্র ৪.৪: অর্থ বিলের ওপর জনমত যাচাই ও সংশোধনী প্রস্তাব (শতাংশ)

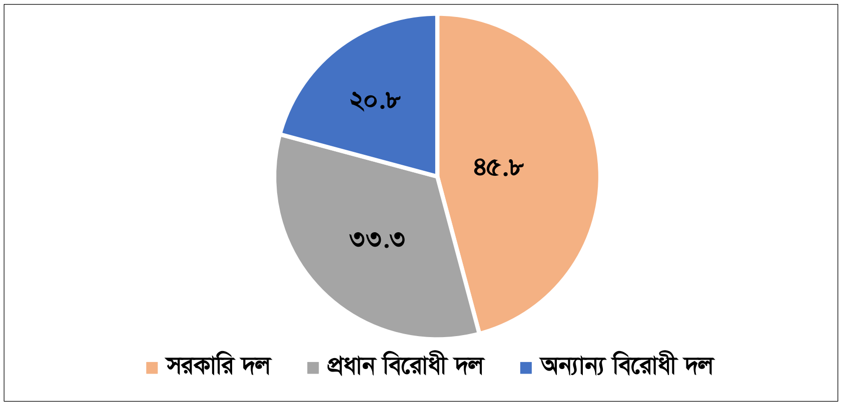

বাজেট বিষয়ক সাধারণ আলোচনায় আলোচ্য বিষয়সমূহ

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যেই ছিল পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা, ব্যাকিংখাতের দুরবস্থা ও ঋণখেলাপী, সার্বজনীন পেনশন, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি পরিবর্তন, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান, আমদানী নির্ভরতা কমানো, প্রগতিশীল কর নীতি বাস্তবায়ন, করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর প্রদান ব্যবস্থা সহজীকরণ, মেডিটেশনের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার, আইসিটি পণ্যের ওপর ভ্যাট হ্রাসকরণ, তামাকজাত পণ্যের ওপর ভ্যাট ও মূল্য বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ ও তা যথাযথভাবে বন্টন নিশ্চিতকরণ, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে সরকারি দলের সদস্যরা বাজেট বরাদ্দকে সরকারের সফলতার নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করেন। করোনা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতেও এতো বড় অংকের বাজেট প্রস্তাব সরকারের সক্ষমতাকে নির্দেশ করে এবং উক্ত বাজেট ব্যবসা বান্ধব, গণবান্ধব, নারী বান্ধব, এবং যুগোপযোগী হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বাজেটকে সমর্থন করে সরকারি দলের সদস্যদের পক্ষ হতে বলা হয়,

> "সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় ও ব্যয়ের বাজেট।"

অন্যদিকে, প্রধান ও অন্যান্য বিরোধীদল বাজেট সার্বিকভাবে জনবান্ধব হয়নি; সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে জনগণের জন্য নয় বরং, সরকারের নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর বিশেষ করে আমলা ও বড় ব্যবসায়ীদের সুবিধা মোতাবেক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে দাবি করেন। প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...বাজেটকে জনবান্ধব বাজেট বলা যাবে না তবে ব্যবসা-বান্ধব বলা যায়। কঠিন পরিস্থিতি আমলে না নিয়ে মনে হয় বাজেটটি করেছেন। বড় ব্যবসায়ীদের জন্য বেশি সুবিধা রাখা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা কম...।"*

অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...সরকারের দিক থেকে বাজেট ঠিক আছে। ক্ষমতায় থাকতে যাকে প্রয়োজন তার জন্যই তো বাজেট হবে। ক্ষমতায় থাকতে যদি জনগণের ম্যান্ডেটের প্রয়োজন হতো তাহলে বাজেট হতো জনগণের। আপনার হাতে যে সম্পদ আছে সেটা আপনি ব্যয় করবেন যাদের আপনার প্রয়োজন তাদের পেছনে। তাই বাজেট আমলা ও ব্যবসায়ীদের জন্য হয়েছে... সরকারের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে তার বাজেটের চরিত্র কেমন হবে। সরকার যদি হয় বাই দ্যা লুটার্স, ফর দ্যা লুটার্স, অফ দ্যা লুটার্স তাহলে বাজেটও ঐ লুটেরাদের জন্যই হবে, সাধারণ মানুষ কোনো উপকারই পাবে না...।"*

বাজেটের ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনা নিয়েও প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের বক্তব্যে সংশয় প্রকাশ করেন। বড় অঙ্কের ঘাটতি নিয়ে বাজেট এবং সেই ঘাটতি পূরণের জন্য যে পরিকল্পনা তা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত নয় বলে তারা মনে করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে বড় ধরনের সংশোধন আনার প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়। প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য এই প্রসঙ্গে বলেন,

[৭০] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৩

"দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘাটতি বাজেট এটি, বাজেটে অনুদানসহ ঘাটতির পরিমাণ- ২ লাখ ১১ হাজার ১৯১ কোটি টাকা যা জিডিপির ৬ দশমিক ১ শতাংশ। অনুদান বাদ দিলে ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এত ঘাটতি পূরণ করতে যেই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। আমি মনে করি বাজেটের ব্যাপকভাবে সংশোধন বা রদবদল করতে হবে।"

অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

"বাজেটের আয় ও ব্যয়ের যে অসঙ্গতি- বাজেটে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা, ঘাটতি ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এই ঘাটতি বাজেট কোথা থেকে আসবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।"

বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত বলে কিছু সদস্য তাদের মতামত প্রকাশ করেন। তবে এক্ষেত্রে শুধু বরাদ্দ বাড়ানো নয়; বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সার্বিকভাবে, খাতভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

"ব্যবসাবান্ধব বাজেট হলে কী হবে যদি ইম্যুনাইজ করা না যায়; শিক্ষায় বাজেট দিয়ে কী হবে যদি স্কুল না খোলে! স্বাস্থ্যখাতে বাজেট দিয়ে কী হবে যদি হাসপাতালে ঠাই নাই অবস্থা থাকে; পরিবহনবান্ধব বাজেট দিয়ে কী হবে যদি পরিবহন না চলে; দরকার ইম্যুনাইজ করা।"

বাজেট অধিবেশনের অন্যতম একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব। সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলের একাংশ এই প্রস্তাবের সমর্থন করে এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখান পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা হলে এর মাধ্যমে দেশের বিনিয়োগ বাড়বে এবং এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলের কিছু সদস্যসহ অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

"... (এবারের বাজেট) পাচারকারী ও লুটেরাদের বাজেট। পাচারকারীদের অর্থ নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা বা বিদেশে ভোগ করার বৈধতা দিতে এবারের বাজেট...অর্থপাচারকারীদের শাস্তি না দিয়ে নামমাত্র কর দিয়ে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব অনৈতিক ও টাকা পাচারে উৎসাহ দিবে... দীর্ঘ ১৪ বছরে কিছু প্রভাবশালী লোকজনই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করে নিয়েছে। পাচারকৃত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দিলে তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক মানদণ্ডে অগ্রহণযোগ্য।"

প্রধান বিরোধী দলের আরেকজন সদস্য বলেন,

"... (এ প্রস্তাব) দুর্নীতি দমন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক- এই আইন সংশোধন না করে পাচারকৃত টাকা ৭ শতাংশ ট্যাক্স দিয়েও আনার কোনো সুযোগ নেই। প্রস্তাবটি বেআইনি, অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য..."

সার্বিকভাবে বাজেট বিষয়ক আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের এক তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায়। বাজেট আলোচনার বেশির ভাগ সময়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময়ই ব্যয় হয়েছে বাজেট বহির্ভূত অন্যান্য আলোচনায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, এলাকার জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া, ডিজিটাল বাজেট উপস্থাপনা ও মন্ত্রীর প্রশংসা, দলের ও সরকারের প্রশংসা এবং অন্য দলের সমালোচনা।

চিত্র ৪.৫: বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

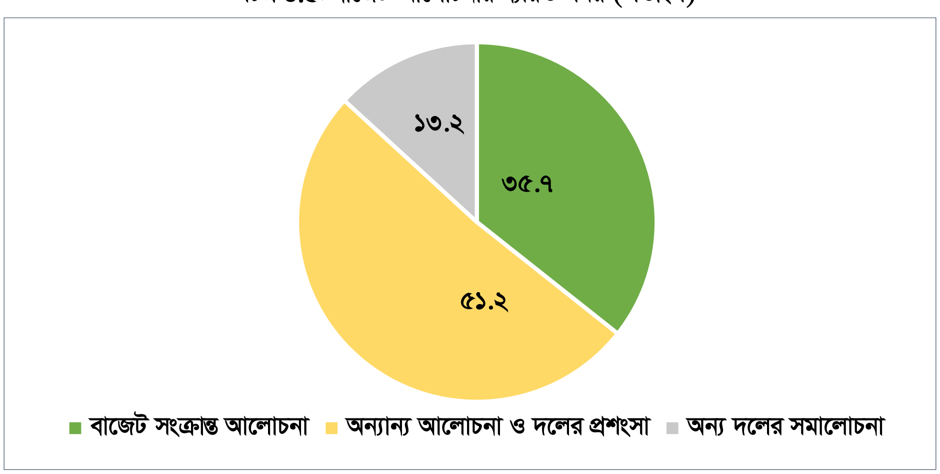

সংসদে বাজেট আলোচনার সীমিত সময়ের অধিকাংশেরও বেশি ব্যয় হয়ে যায় বাজেট বহির্ভূত বিভিন্ন আলোচনায়। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেও যে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয় এবং বির্তক আনুষ্ঠিত হয় তার খুব একটা প্রভাব বাজেটের ওপর পড়ে না। বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব থাকলেও উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই 'বাজেট ও 'অর্থবিল' সংসদে পাস হয়ে যায়। আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও তা এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...বাজেট প্রস্তুতিতে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আলোচনা করছি, কিন্তু তাতে বাজেটের পরিবর্তন আসবে না...বাজেট অ্যাপ্রোচ টপ ডাউন থেকে পরিবর্তন করে বটম আপ করা দরকার..."।*

বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষেত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থবছরের অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। অর্থ বিলে সংশোধনীর সুযোগ না থাকায় সংসদকে সার্বিকভাবে বাজেট অনুমোদন দিতে হয়, যা নির্বাহী কর্তৃত্বের ইঙ্গিতবাহী।[৭১]

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন হবে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক। জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের বিচার বিশ্লেষণ ও মতামতের সমন্বয় শেষেই তা জাতীয় সংসদে বাজেট আকারে অনুমোদিত হবে।[৭২] বাজেট মূলত মুখ্য পরিকল্পনার দলিল, আয় ব্যয়ের খতিয়ান যা সার্বিকভাবে আর্থিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি, কার্যকারিতা ও উপযোগীতার নির্ধারক। বাজেটের আয় ও ব্যয় জনগণের অর্থ। সে অর্থে বাজেট মূলত জনগণের প্রতি সরকারের আয়-ব্যয়ের দায়বদ্ধতার দলিল বলা চলে। তাই এই অর্থ ব্যবস্থাপনা গণমুখী জনবোধগম্য করার মাধ্যমে এখানে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।[৭৩] কিন্তু, বাংলাদেশের বাজেট প্রণীত হয় মূলত আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাহী বিভাগের একক নিয়ন্ত্রণে।[৭৪] সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। যেখানে ওপর থেকে আসা আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন ও নীতিনির্দেশনার আলোকে নিচ থেকে বাজেট তৈরি হয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয়ভাবে বেঁধে দেওয়া বরাদ্দের সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে যা অবশেষে হিসাব মেলানোর বাজেটে পরিণত হয়। ফলে ওপর থেকে আসা বাজেট প্রাক্কলন অনুযায়ি বাস্তবায়িত বাজেটে মাঠ পর্যায়ের ভাবনা, চাহিদা ও দাবির প্রতিফলন খুব একটা হয় না। জনগণের প্রতি সরকারের এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়বদ্ধতার উপায় হিসেবে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ ব্যাহত হয়।[৭৫]

আমাদের দেশে সংসদে বাজেট উপস্থাপন করার পর এর ওপর বিশ্লেষণের সুযোগ খুব সীমিত। সংশ্লিষ্ট কমিটি থাকলেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে মাত্র একদিনের মধ্যে কমিটি হতে অনুমোদন দেওয়া হয়, ফলে বিশ্লেষণের সুযোগ সেখানে নেই বললেই চলে। উন্নত দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রস্তাবিত বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে থাকে যেখানে বাজেট প্রণয়নের সংশ্লিষ্টদেরকে নানাভাবে কমিটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কমিটি অনুমোদন ব্যতীত বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয় না। একই সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছেও বাজেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জবাবদিহি করতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের আলোকে বাজেটে বড় ধরনে পরিবর্তনও আনা হয়ে থাকে। সেখানে আমাদের দেশে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর এই ধরনের বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি বলতে গেলে অনুপস্থিত। প্রস্তাবিত বাজেট সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর নাম মাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই (বাক্যের গঠনগত বা শব্দগত পরিবর্তন) তা প্রায় অনুরূপভাবেই অনুমোদিত হয়ে যায়। বাজেট নিয়ে আলোচনার সময়ও থাকে খুব সীমিত। সেই সীমিত সময়ের উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, প্রশংসা ও সমালোচনাতেই ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া আগের বছরের বাজেটের সফলতা ব্যর্থতা দিয়ে কোন পর্যালোচনা সংসদে করা হয় না। অনেকটা গতানুগতিক ভাবেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কণ্ঠভোটে সংসদে সম্পূরক বাজেট পাস করে দেওয়া হয়।[৭৬]

---

[৭১] '*বাংলাদেশের বাজেট*' - ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান; দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১০।
[৭২] '*বাংলাদেশের বাজেট*' - ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান; দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১০।
[৭৩] 'বাজেট দায়বদ্ধতার দলিল' - ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ; কালের কণ্ঠ, ০১ জুন, ২০১৭।
[৭৪] 'বাজেট ব্যবস্থাপনায় নানা বৈপরীত্য' - রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর; প্রথম আলো, ২৭ জুন, ২০২০।
[৭৫] 'বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির সংস্কার সময়ের দাবি' - ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ; যুগান্তর, ০৭ জুন, ২০১৮।
[৭৬] 'বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতিতেই গলদ আছে' - ড. আহসান এইচ মনসুর; যুগান্তর, ০৫ মে ২০২৩।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনা, বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পর্ব, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রম জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, মুলতবি প্রস্তাব এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কার্যপ্রণালী বিধির ৪১ বিধি অনুযায়ী, স্পিকার অন্যরূপ কোনো নির্দেশ না দিলে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অধিবেশন কালে প্রতি বুধবার বৈঠকের শুরুতেই অতিরিক্ত প্রথম ৩০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ও উত্তরদানের জন্য বরাদ্দ থাকবে। তবে বাজেট উপস্থাপনের দিন কোনো প্রশ্নকাল থাকবে না।[৭৭] প্রথম থেকে ২২টি অধিবেশনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য নির্ধারিত ছিল ৩৯ দিন যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সংসদে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন ১৮ দিন এবং উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়েছে ২১ দিন। অন্যদিকে মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য নির্ধারিত ছিল ২০৭ দিন যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রতি/উপমন্ত্রীগণ সংসদে সরাসরি উত্তর দিয়েছেন ৪২ দিন এবং উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়েছে ১৬৫ দিন। অর্থাৎ, প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোর বিপরীতে প্রশ্নমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব সংসদে সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ দিন এবং মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব সংসদে সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০ দশমিক ৩ শতাংশ দিন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রথম হতে দ্বাবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য প্রায় ১৩ ঘন্টা ২ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়। এর মধ্যে সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৯ ঘন্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয় করেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সদস্যদের প্রশ্ন উত্থাপন এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয় ৩ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সময়। সপ্তম অধিবেশন ব্যতীত একাদশ সংসদের ২২টি অধিবেশনেই এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি উত্তর প্রদান করেছেন মোট ১১টি অধিবেশনের ১৮ কার্যদিবসে। অধিবেশনগুলো হচ্ছে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ৯ম, ১৭তম, ২০তম ও ২১তম অধিবেশন। বাকি অধিবেশনগুলোর কোনো বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি সংসদে সদস্যের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেননি। এখানে উল্লেখ্য, ১০ম হতে ১৬তম মোট সাতটি অধিবেশনে একটানা প্রধানমন্ত্রী সংসদে সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেননি। সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রীকে মোট ৩৩টি মূল প্রশ্ন ও ৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন করা হয়। মোট ৩৯ জন (৯.১ শতাংশ) সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ২৬ জন সরকারি দলের, আটজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য এবং পাঁচজন ছিলেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ২৫টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ৪১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ছয়টি মূল প্রশ্ন এবং ৩২টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা দুইটি মূল প্রশ্ন এবং ১০টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন।[৭৮]

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশ্নকারী সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য ছিলেন মোট তিনজন (৭.৭ শতাংশ) এবং পুরুষ সদস্য ছিলেন মোট ৩৬ জন (৯২.৩ শতাংশ)। নারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের সরাসরি নির্বাচিত একজন সদস্য ছিলেন এবং প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী দল হতে একজন করে সদস্য ছিলেন যাদের উভয়েই সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের থেকে ২৫ জন, প্রধান বিরোধী দলের সাতজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের চারজন সদস্য এই পর্বে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি করা ৩৩টি মূল প্রশ্নের মধ্যে ৩২টি (৯৭.০ শতাংশ) প্রশ্ন করেন পুরুষ সদস্যরা এবং একটি (৩.০ শতাংশ) প্রশ্ন করেন সংরক্ষিত আসন হতে প্রধান বিরোধীদলের একজন নারী সদস্য। সম্পূরক প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৮৩টি প্রশ্নের মধ্যে ৮০টি (৯৬.৪ শতাংশ) প্রশ্ন করেন পুরুষ সদস্যরা এবং দুইটি (৩.৬ শতাংশ) প্রশ্ন করেন নারী সদস্যরা, যাদের একজন ছিলেন সরকারি দল হতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং একজন ছিলেন অন্যান্য বিরোধীদলের সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্য। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। গড়ে মোট ৬৩ শতাংশ সংসদ সদস্য এই কার্যদিবসগুলোতে উপস্থিত ছিলেন যেখানে সার্বিকভাবে কার্যদিবস প্রতি গড় উপস্থিতি ছিল ৫৫ শতাংশ।

[৭৭] বিস্তারিত দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ৮ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ক।

[৭৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৪

প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন সেগুলোকে প্রধানত ১১টি ভাগে ভাগ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুজিববর্ষ বিষয়ক, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্প বিষয়ক, দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক, যুব সমাজের উন্নয়ন বিষয়ক, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত, দ্রব্যমূল্য ও জ্বালানী তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থানায় গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ক, দুর্নীতি, জঙ্গী ও মাদক দমন বিষয়ক ও অন্যান্য। এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্প বিষয়ক (গ্রামকে শহরে রূপান্তর, তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন, পদ্মাসেতু ও বরিশাল রেললাইন প্রসঙ্গ, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ঢাকার যানজট নিরসন, পোশাক শিল্পের সুতা আমদানি ও সমৃদ্ধ শিল্পখাত গঠন) প্রশ্ন করা হয় সাতটি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুজিববর্ষ বিষয়ক (মুজিববর্ষ উদযাপন, পাঠ্য পুস্তকে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সংযুক্তি, মুজিবর্ষ উপলক্ষ্যে বাড়ি নির্মান প্রকল্প) প্রশ্ন করা হয় মোট পাঁচটি, দ্রব্যমূল্য ও জ্বালানী তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক (দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হ্রাস, রমজান মাসে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার তদারকি, জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস) প্রশ্ন করা হয় তিনটি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্জন বিষয়ক (ইউনেস্কোর নির্বাহি পরিষদে সহ-সভাপতি নির্বাচন, মার্কিন কংগ্রেসে ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব উত্থাপন এবং জাতিসংঘ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকা) প্রশ্ন করা হয় তিনটি, দুর্নীতি, জঙ্গি ও মাদক দমন বিষয়ক (শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে না জড়ানো, যুব সমাজকে মাদক হতে মুক্ত রাখা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ) প্রশ্ন করা হয় তিনটি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত বিষয়ক (কৃষিতে ভর্তুকি ও ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ) প্রশ্ন করা হয় তিনটি, দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক (বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতিতে দরিদ্র্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জন) প্রশ্ন করা হয় দুইটি, যুব সমাজের উন্নয়ন বিষয়ক (যুব সমাজের উন্নয়ন এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ) প্রশ্ন করা হয় দুইটি, দুর্যোগ বা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ক (করোনার সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহয়তা এবং চিকিৎসকদের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ) প্রশ্ন করা হয় দুইটি, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার) প্রশ্ন করা হয় একটি, এবং অন্যান্য বিষয়ে (একাদশ জাতীয় নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়া বিষয়ক) প্রশ্ন করা হয় দুইটি।

চিত্র ৫.১: প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (শতাংশ)

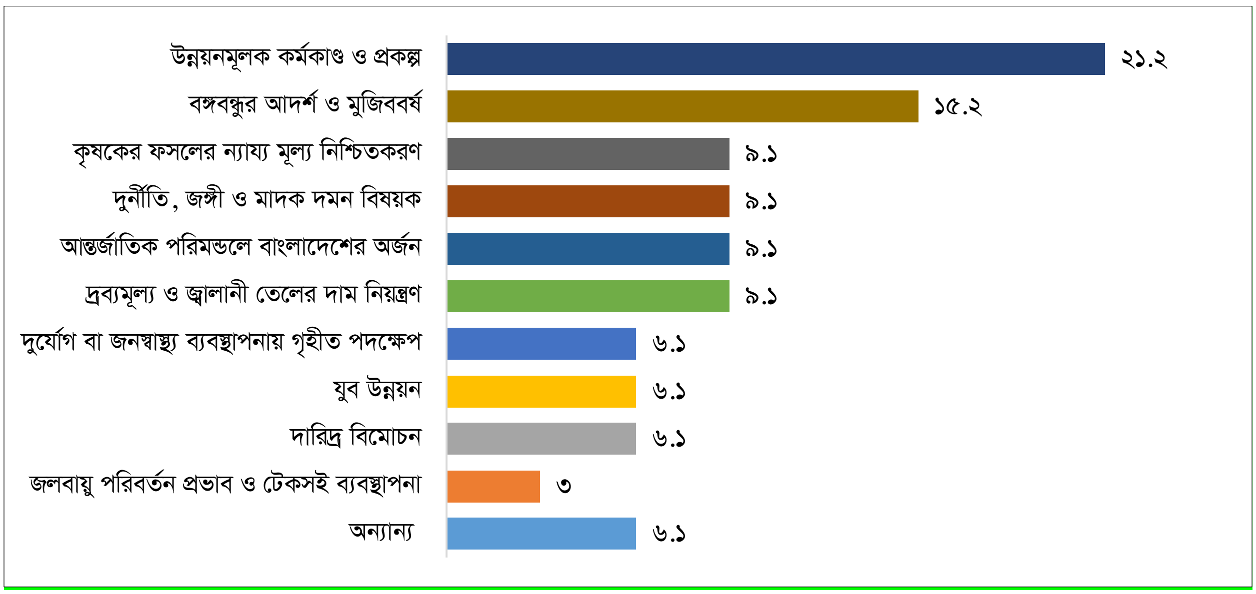

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে লক্ষ্য করা যায়, সংসদ সদস্যরা মূল প্রশ্ন করা থেকে সম্পূরক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় করেছেন। মূল প্রশ্ন উপস্থাপনে যেখানে গড়ে এক মিনিট এর থেকেও কম সময় লেগেছে সেখানে সম্পূরক প্রশ্ন করতে গড়ে দেড় মিনিটের থেকেও বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। কোনো কোনো প্রশ্নদাতা এক্ষেত্রে প্রায় তিন মিনিট সময় পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। অনেকক্ষেত্রেই মূল বক্তব্য উপস্থাপন না করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, বিরোধী দলের সমালোচনা এবং অন্যান্য আলোচনা উপস্থাপন করে অধিকাংশ সময় ব্যয় করা হয়েছে। আবার অনেকক্ষেত্রেই প্রশ্ন উপস্থাপন না করে নিজ এলাকার জন্য কোনো দাবি বা প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্পূরক প্রশ্ন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্পিকার বার বার সদস্যদের মূল প্রশ্ন করার জন্য তাড়া দিয়েছেন। আবার দেখা গেছে মূল প্রশ্নের বিপরীতে সম্পূরক প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হলে সদস্যরা অন্য প্রসঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সরকারি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে সম্পূরক প্রশ্ন করার সময় বিশেষ কোনো দলের সমালোচনা করে প্রশ্ন উত্থাপনের পাশাপাশি উত্তরদানের সময় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ কোনো দলের সমালোচনার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল।

চিত্র ৫.২: সম্পূরক প্রশ্নোত্তরে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

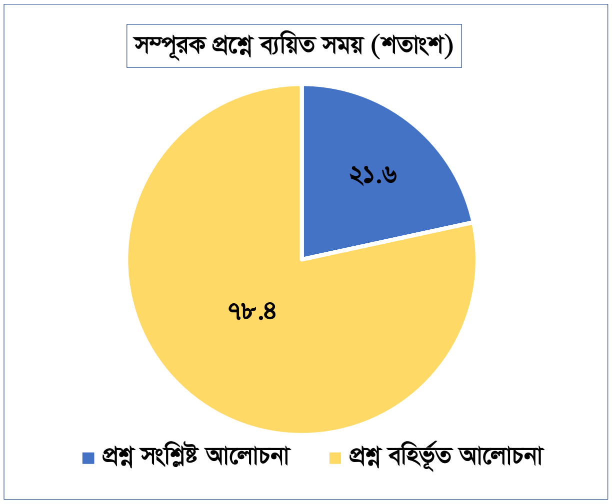

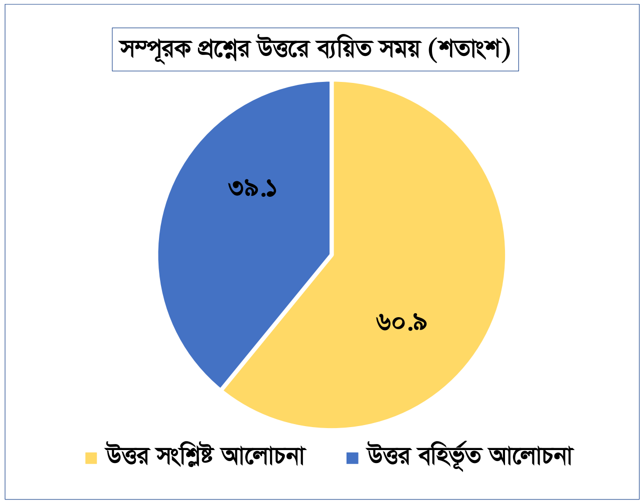

সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য আলোচনা করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের ৭৮ দশমকি ৪ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের ব্যয়িত সময়ে ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ ব্যয়িত হয় প্রাসঙ্গিক উত্তরের বাইরে অন্যান্য আলোচনায়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

একাদশ সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের নির্ধারিত মোট ২০৭ কার্যদিবসের মধ্যে ৪২ কার্যদিবসে মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের মতই ৭ম অধিবেশন ব্যতীত একাদশ সংসদের ২১টি অধিবেশনেই এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তবে ৯টি অধিবেশনের ৪২ কার্যদিবসে মন্ত্রীগণ সংসদ সদস্যদের আনীত প্রশ্নের উত্তর সরাসরি সংসদে প্রদান করেন। অধিবেশনসমূহ হচ্ছে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১৮তম, ১৯তম ও ২০তম অধিবেশন। বাকি অধিবেশনগুলোর কোনো বৈঠকে মন্ত্রীগণ সরাসরি সংসদে সদস্যের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেননি। ৭ম হতে ১৭তম টানা মোট ১১টি অধিবেশনে সংসদে মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর প্রদান অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম হতে দ্বাবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য প্রায় ৪৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়। যার মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করার জন্য সংসদ সদস্যরা ব্যয় করেন প্রায় ১০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যয় করেন ১৮ ঘণ্টা ৫১ মিনিট।

সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৪৯ জন সংসদ সদস্য ৩১টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে ২০০টি মূল প্রশ্ন এবং ৫৬৪টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১১৬ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের নয়জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ১৫৭টি (৭৮.৫ শতাংশ) এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ৪১০টি (৭২.৭ শতাংশ)। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৩৪টি (১৭.০ শতাংশ) মূল প্রশ্ন এবং ১০৪টি (১৮.৪ শতাংশ) সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা নয়টি (৪.৫ শতাংশ) মূল প্রশ্ন এবং ৫০টি (৮.৯ শতাংশ) সম্পূরক প্রশ্ন করেন।[৭৯]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশ্নকারী সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য ছিলেন মোট ২৯ জন (৮০.৫%) এবং পুরুষ সদস্য ছিলেন মোট ১২০ জন (১৯.৫%)। নারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ২৬ জন যাদের মধ্যে সাতজন ছিলেন সরাসরি নির্বাচিত আসনের এবং নয়জন ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে, প্রধান বিরোধী দলের ছিলেন দুইজন যার মধ্যে একজন ছিলেন সরাসরি নির্বাচিত আসনের এবং একজন ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে, অন্যান্য বিরোধী দলের ছিলেন একজন যিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের থেকে ১১৬ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের নয়জন সদস্য এই পর্বে মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্ন করেন। মন্ত্রীদেরকে সরাসরি করা মূল প্রশ্নের মধ্যে পুরুষ সদস্যরা ১৭৩টি (৮৬.৫ শতাংশ) প্রশ্ন করেন এবং নারী সদস্যরা ২৭টি (১৩.৫ শতাংশ) প্রশ্ন করেন। সম্পূরক প্রশ্নের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যরা ৪৯৩টি (৮৭.৪ শতাংশ) প্রশ্ন করেন এবং নারী সদস্যরা ৭১টি (১২.৬ শতাংশ) প্রশ্ন করেন। নারী সদস্যদের মধ্যে আটজন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য পাঁচটি মূল প্রশ্ন ও ১৫টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন এবং সংরক্ষিত আসনের ১১ জন সদস্য ২২টি মূল প্রশ্ন ও ৫৬টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন।

[৭৯] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৪

প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যরা মোট ৩১টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সবচেয়ে বেশি মোট ২২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়ে যা মোট উত্থাপিত মূল প্রশ্নের ১১ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩, ১২, ১২, ১২, ১১ ও ১০টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে জন্য নয়টি করে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পাঁচটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য চারটি করে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জন্য তিনটি করে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সবচেয়ে কম প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে। এই চারটি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

সারণী ৫.১: মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রাপ্ত প্রশ্নের হার[৮০]

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা	শতকরা
সর্বাধিক প্রশ্নপ্রাপ্ত চারটি মন্ত্রণালয়		
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২২	১১.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩	৬.৫
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
সর্বনিম্ন প্রশ্নপ্রাপ্ত চারটি মন্ত্রণালয়		
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১	০.৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১	০.৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১	০.৫
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	০.৫

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের মতো মন্ত্রীদের নিকট সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বেও লক্ষ্য করা যায়, সংসদ সদস্যরা মূল প্রশ্ন করার থেকে সম্পূরক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় করেছেন। মূল প্রশ্ন উপস্থাপনে যেখানে গড়ে ১৪ থেকে ১৫ সেকেন্ড লেগেছে সেখানে সম্পূরক প্রশ্ন করতে গড়ে এক মিনিটের বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। কোনো কোনো প্রশ্নদাতা প্রশ্ন করতে তিন মিনিটেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন। অনেকক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, নিজ দলের প্রসংশা, বিপক্ষ দলের সমালোচনা, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক অন্যান্য আলোচনা করে প্রশ্ন উপস্থাপন সময়কে দীর্ঘায়িত করেছেন। ফলে প্রশ্ন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্পিকার বার বার সদস্যদের নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করার জন্য তাড়া দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে মূল প্রশ্নের বিপরীতে সম্পূরক প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলে সদস্যরা অন্য প্রসঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সরকারি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে সম্পূরক প্রশ্ন করার সময় বিশেষ কোনো দলের সমালোচনা করে প্রশ্ন উত্থাপনের পাশাপাশি উত্তরদানের সময় মন্ত্রীগণ কর্তৃক বিশেষ কোনো দলের সমালোচনার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল।

চিত্র ৫.৩: সম্পূরক প্রশ্নোত্তরে ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

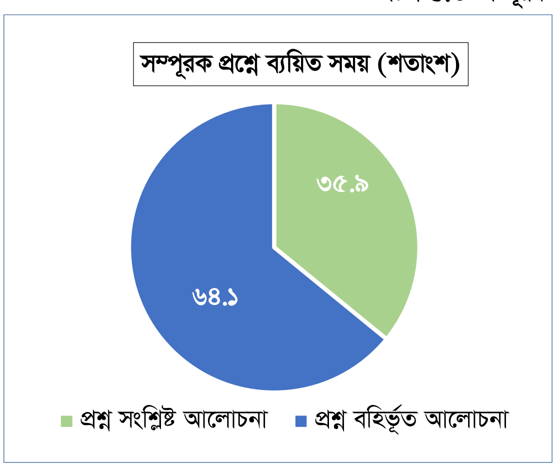

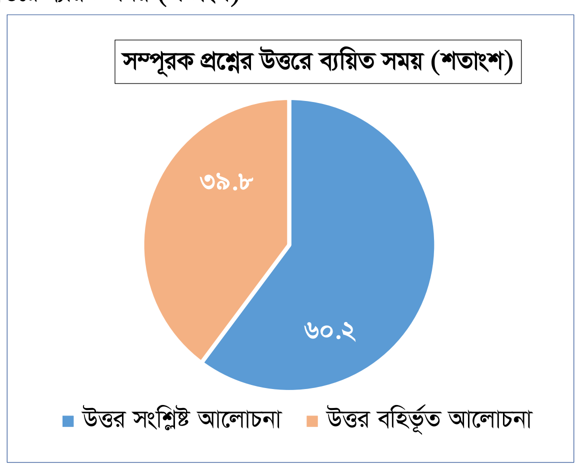

[৮০] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৫

সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য আলোচনা করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের ৬৪ দশমিক ১ শতাংশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রসঙ্গ বহির্ভূত আলোচনার কারণে নির্ধারিত সময়ে মূল প্রশ্নই উপস্থাপিত হয়নি। সম্পূরক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মূল উত্তরের বাহিরে অন্যান্য আলোচনা করেন যা উত্তর প্রদানে মোট ব্যয়িত সময়ের ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ সময়।

অনির্ধারিত আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের মধ্যে শুধু সপ্তম অধিবেশন ব্যতিত বাকি ২১টি অধিবেশনেই অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি অধিবেশনের মোট ১০৬ কার্যদিবসে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ব্যয়িত হয় ২২ ঘণ্টা ১১ মিনিট সময় যা সংসদের মোট কার্যক্রম পরিচালনার ৩ দশমিক শূন্য শতাংশ সময়। অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ে ১০ শতাংশেরও বেশি সময় ব্যয় হয়েছে মোট তিনটি অধিবেশনে (১ম, ১৮তম ও ২০তম অধিবেশনে)। উক্ত অধিবেশনগুলোতে যথাক্রমে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ (২ ঘণ্টা ২০ মিনিট), ১২ দশমিক ২ শতাংশ (২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট) ও ১১ দশমিক ৭ শতাংশ (২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) সময় ব্যয় হয়েছে। সবচেয়ে কম সময় ব্যয় হয়েছে ১০ম, ১১তম ও ২২ তম অধিবেশনে। উক্ত অধিবেশনগুলোতে যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ (৮ মিনিট), শূন্য দশমিক ২ শতাংশ (২ মিনিট) ও শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ (১২ মিনিট) সময় ব্যয় হয়েছে।

অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ২৬০টি আলোচনা উপস্থাপিত হয় যার মধ্যে ১১০টি (৪২.৩ শতাংশ) উত্থাপিত হয় সরকার দল হতে, ৮৬টি (৩৩.১ শতাংশ) উত্থাপিত হয় প্রধান বিরোধীদলের পক্ষ হতে এবং ৬৪টি (২৪.৬ শতাংশ) উত্থাপিত হয় অন্যান্য বিরোধী দল হতে। আলোচনাসমূহের মধ্যে পুরুষ সদস্যদের দ্বারা ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ (২৪০টি) আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী সদস্যদের দ্বারা ৭ দশমিক ৭ শতাংশ (২০টি) আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য দ্বারা ৩ দশমিক ৫ শতাংশ (৯টি) আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের নারী সদস্য দ্বারা ৪ দশমিক ২ শতাংশ (১১টি) আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫২ জন সংসদ সদস্য অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ৩৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন আটজন এবং অন্যান্য দলের সদস্য ছিলেন সাতজন। সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ৩০ জন, নারী সদস্য ছিলেন সাতজন যাদের মধ্যে নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন চারজন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন তিনজন। প্রধান বিরোধী দলের আটজন সদস্যই পুরুষ সদস্য ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন পুরুষ সদস্য এবং একজন ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য।[৮১]

সারণি ৫.২: অনির্ধারিত আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ

দল	পুরুষ	নারী		মোট	শতকরা
		নির্বাচিত	সংরক্ষিত		
সরকারি দল	৩০	৪	৩	৩৭	৭১.২
প্রধান বিরোধী দল	৮	০	০	৮	১৫.৪
অন্যান্য বিরোধী দল	৬	০	১	৭	১৩.৫
মোট	৪৪	৪	৪	৫২	১০০

অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে যে বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা; অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা; মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি বিষয়ক আলোচনা; সংসদীয় কার্যক্রম, আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং অন্যান্য আলোচনা। অনির্ধারিত আলোচনার মোট ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ আলোচনা হয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনা ও জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে, ১২ দশমিক ৪ শতাংশ আলোচনা হয়েছে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক, ১২ শতাংশ আলোচনা হয়েছে মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি বিষয়ক, ১১ দশমিক ৩ শতাংশ আলোচনা হয়েছে সংসদীয় কার্যক্রম, আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং ২০ দশমিক ৮ শতাংশ আলোচনা হয়েছে অন্যান্য বিষয় নিয়ে।

[৮১] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৬

চিত্র ৫.৪: অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের ধরনসমূহ (শতাংশ)

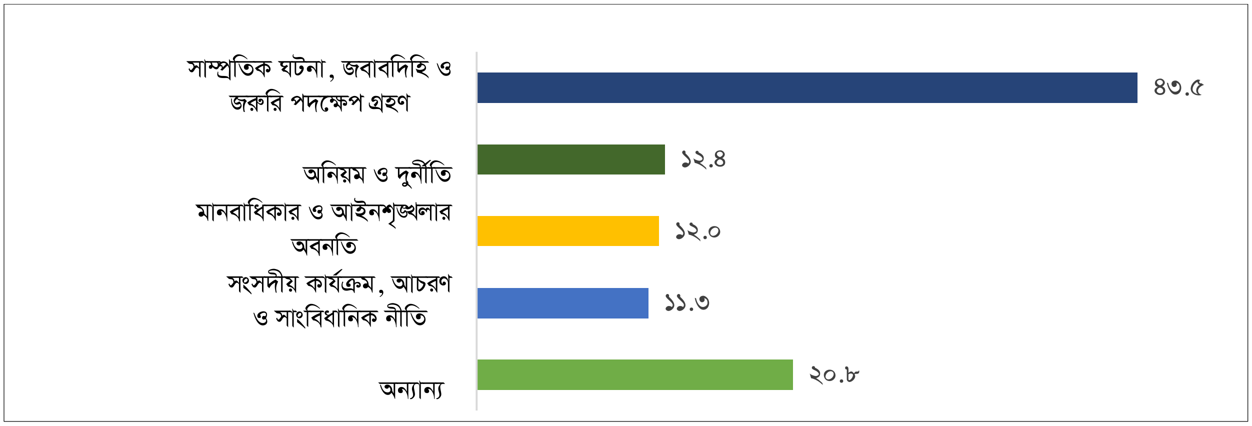

সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনায় যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রোহিঙ্গা ইস্যু, আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন জঙ্গি হামলা, জাতীয় পরিসরে ধর্ষণ ও হত্যা, শেয়ার বাজারের ধস, ক্রিকেট টিমের জার্সি বিতর্ক, গ্যাস ও বিদ্যুতের অবস্থা, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, তেল ও পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি, টাকা পাচার, করোনা পরিস্থিতি, রেল ও সড়কসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও অগ্নিকাণ্ড, বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিবাদ ইত্যাদি। অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, ভোগ্যপণ্য ও ওষুধে ভেজাল, স্বাস্থ্যখাতের বেহাল অবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল নির্বাচনী নাশকতা ও ভোট কারচুপি, মাদক ও জুয়া, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। সংসদীয় কার্যক্রম, আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি সম্পর্কিত আলোচনায় যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সদস্যদের সংসদে উপস্থিতিতে অনীহা, নোটিশ প্রদান করে সদস্যদের অনুপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বে অপ্রয়োজনীয় বক্তব্য রেখে সময়ক্ষেপন, সংসদীয় কাজে বাংলা শব্দের ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ নোটিশগুলো আলোচনার সুযোগ না দেওয়া, অসংসদীয় ভাষা ও অসত্য তথ্য প্রসঙ্গ, প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে উত্তর দেওয়া ও প্রশ্ন এড়িয়ে না যাওয়া, বিধিবিধান মেনে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ও বক্তব্য পেশ করা ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্মৃতিচারণ, শোক প্রকাশ, প্রশংসা, সমালোচনা/দলীয় বিতর্ক, সংসদের বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসার দাবি বা জবাবদিহি, ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা, দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা, সদস্যদের প্রদত্ত বিভিন্ন বিধিতে নোটিশের হালনাগাদ অবস্থা জানতে চাওয়া ইত্যাদি।

এই পর্বে আলোচনার সময় দেখা গেছে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও আলোচনার সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরাসরি প্রতিপক্ষ দল এবং দলের কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ আনা হয়েছে বা সমালোচনা করা হয়েছে। অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে বিতর্ক ও সমালোচনামূলক বক্তব্যের জের ধরে অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যে একটি দল দুইবার ওয়াক আউট করে।

সাম্প্রতিক সময়ের একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে মাদক ও জুয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা সংসদের অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাদক ও জুয়া বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন বিভিন্ন সদস্য। এই বক্তব্যে অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য মাদক ও জুয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক অরাজকতা এবং এর সাথে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালীদের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং মাদক ও জুয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে সরকারি দলের সদস্য হতে সরাসরি সমালোচনা করা হয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

> *"বঙ্গবন্ধু হাউজি-জুয়া-মদ্যপান বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু, জিয়াউর রহমান মদের লাইসেন্স দিয়েছিলেন, হাউজির লাইসেন্স দিয়েছিলেন। প্রিন্সেস জরিনা লাকি খানের নাচ এই বাংলাদেশে চালু করেছিলেন। 'হিজবুল বাহার' নৌবিহারে নিয়ে মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সন্ত্রাসী বানিয়েছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কথা বলার অধিকার তাদের নেই।"*

অন্য আরেকটি বক্তব্যে সরকারী দলের পক্ষ হতে বলা হয়,

> *" বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এটা একটা খুনি ও জঙ্গি সংগঠন। এই দলের জন্ম হয়েছে ক্যান্টনমেন্টে। আজ এই দলের মুখেই শুনতে হচ্ছে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার। এটা জাতির জন্য একটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।"*

আরও বলা হয়,

> *"যারা রাজনীতির জন্য মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে, ঘুমন্ত মানুষের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করে, তারা আইনের শাসনের কথা বলার অধিকার রাখে না।"*

আমের পেটেন্ট বিষয়ক একটি দাবি অন্যান্য দলের একজন সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হলে তার প্রেক্ষিতে সরকার দলের একজন সদস্য তার বক্তব্যে বলেন,

> *"...রাজনীতিতে বিএনপির কিছু উদ্ভাবনের জন্য তাঁর পলিটিক্যাল পেটেন্ট দাবি করা উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। যেমন ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পেটেন্ট, "হ্যাঁ" "না" ভোট দিয়ে কারফিউ দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার পলিটিক্যাল পেটেন্ট, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস অনুপ্রবেশের পেটেন্ট, স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনঃ প্রবেশের পলিটিক্যাল পেটেন্ট, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার পেটেন্ট, রাজনীতিতে অবক্ষয়, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পেটেন্ট, হাওয়া ভবনের মাধ্যমে সরকারের ভিতরে সরকার তৈরি করার পেটেন্ট এবং আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন দিয়ে নির্বাচনকে কলুষিত করার পেটেন্ট।"*

অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে সমালোচনা ও পাল্টা সমালোচনা ছাড়াও দেখা যায় কিছু সদস্য অন্য কার্যক্রমের বক্তব্য এই অংশে উপস্থাপন করছে। কোনো বিধিতে প্রদত্ত নোটিশের বক্তব্য আলোচনার এই অংশে নিয়ে আসছে যা স্পিকারের হস্তক্ষেপে রহিত করা হয়।

সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী)

একাদশ জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনের মধ্যে নয়টি অধিবেশনের মোট ১৯ কার্যদিবসে ১১টি বিষয়ে প্রায় ৬৯ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা সংসদের মোট কার্যক্রমের ৯ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। দ্বিতীয় অধিবেশনের ৪র্থ কার্যদিবসে একটি, ৫ম অধিবেশনের ৪র্থ কার্যদিবসে একটি, ১০ম অধিবেশনের ২য় হতে ৬ষ্ঠ কার্যদিবসে একটি, ১৫তম অধিবেশনের ২য় কার্যবিদবসে একটি এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম কার্যদিবসে একটি, ১৭তম অধিবেশনের ৮ম কার্যদিবসে একটি, ১৮তম অধিবেশনের ৪র্থ কার্যদিবসে একটি, ১৯তম অধিবেশনের ৩য় কার্যদিবসে একটি ও ৪র্থ কার্যদিবসে একটি, ২১তম অধিবেশনের ৪র্থ অধিবেশনে একটি এবং ২২তম অধিবেশনের ২য় হতে ৫ম অধিবেশনে একটি বিষয়ের ওপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ আলোচনার প্রস্তাবগুলো মোট আটজন সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। যার মধ্যে ১০টি (৯১ শতাংশ) প্রস্তাব সরকারি দলের পক্ষ হতে সাতজন (৮৭.৫ শতাংশ) সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় (তিনটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হয়) এবং একটি (৯ শতাংশ) প্রস্তাব প্রধানবিরোধী দলের একজন (১২.৫ শতাংশ) সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। অন্যান্য বিরোধীদল হতে কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। এই আলোচনা পর্বে মোট ১৪৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিল ১৩১ জন (৮৮.৫ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিল ১২ জন (৮.১ শতাংশ) এবং অন্যান্য দলের সদস্য ছিল পাঁচজন (৩.৪ শতাংশ)। দলীয় প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করলে এই হার হবে যথাক্রমে ৪২ শতাংশ, ৪৬ দশমিক ২ শতাংশ, এবং ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ। পুরুষ ও নারী সদস্যদের ক্ষেত্রে আলোচকের হার ছিল যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৪ শতাংশ ও ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ। দলভেদে পুরুষ ও নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের হার ছিল যথাক্রমে সরকারি দলের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ৮৩ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ, এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ।[৮২]

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল সন্ত্রাসী হামলা ও যৌন নিপীড়নের ঘটনার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ, কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনা যেমন, মুজিববর্ষ উদযাপন, 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' প্রবর্তন, 'জয় বাংলা'-কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের চক্রান্তকে পুনরায় সফল হতে না দেওয়া এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে, পদ্মাসেতু প্রসঙ্গে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে, কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অস্থিরতা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জ্বালানি সংকট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলা করার নিমিত্তে সরকারের গৃহীত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই পদক্ষেপসমূহ সংসদে আলোচনার মাধ্যমে জাতিকে অবহিত করার প্রসঙ্গে এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এককভাবে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট আলোচনাতেই সাধারণ আলোচনা পর্বের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সময় ব্যয়িত হয়েছে যা শতাংশের হিসেবে ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ। স্বাধীনতা ও সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে মোট ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ সময়। বাকি ২৩ দশমিক ২ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা ও যৌন নিপীড়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন (পদ্মা সেতু), কোভিড-১৯ এবং বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রসঙ্গে।

[৮২] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৭

চিত্র ৫.৫: সাধারণ আলোচনায় বিষয়ভিত্তিক ব্যয়িত সময় (শতাংশ)

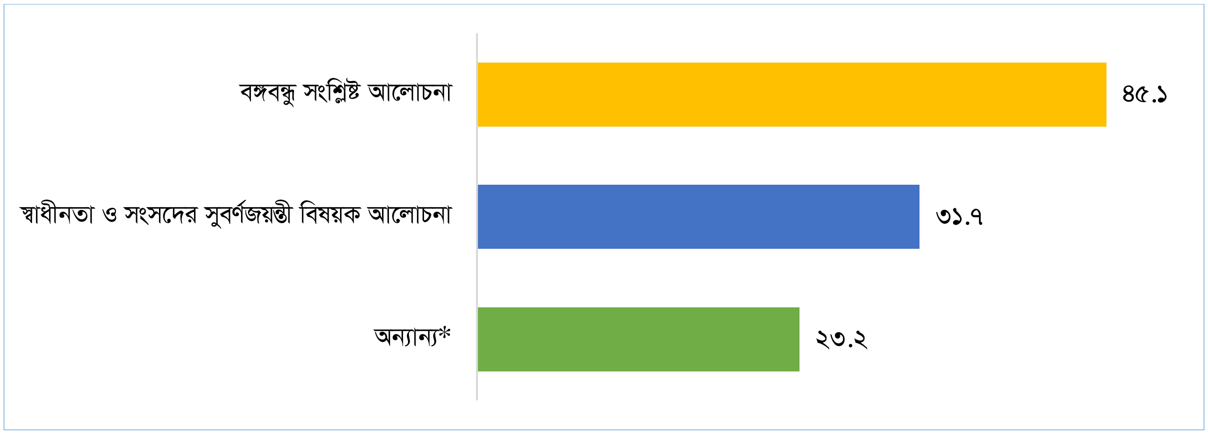

সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট ব্যয়িত সময়ের ৬৪ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনায়। বাকি ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে বিষয় বহির্ভূত আলোচনায়। এক্ষেত্রে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে দলের প্রশংসা ও অন্যান্য আলোচনাতে এবং ৯ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে অন্যদলের সমালোচনায়।

চিত্র ৫.৬: সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার (শতাংশ)

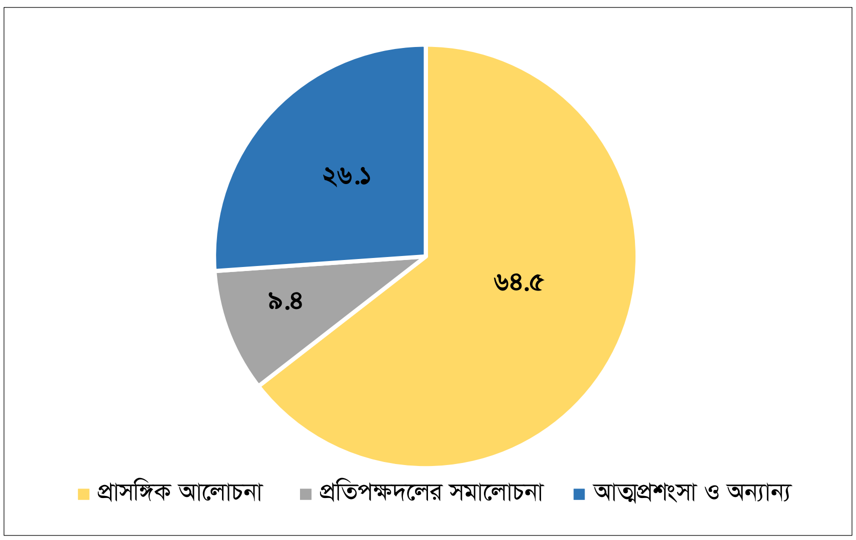

উল্লেখ্য, কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য নোটিশ বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের থাকলেও এই ধরনের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে তুলনামূলকভাবে কম। প্রস্তাব উত্থাপনে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা ছিল খুবই কম। প্রধান বিরোধী দল হতে একটি প্রস্তাব উথাপিত হয়েছে যেখানে অন্যান্য বিরোধী দলের পক্ষ হতে কোনো প্রস্তাবই উত্থাপিত হয়নি। এছাড়াও, কার্যবিধির ১৪৮-এর ২ ধারা মোতাবেক সাধারণ প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার একটি শর্ত হচ্ছে এতে ব্যঙ্গোক্তি, নিন্দা বা মানহানিকর বিবৃতি থাকবে না। যেখানে এই অধিবেশনে আলোচিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ৯ নং প্রস্তাবে স্পষ্টতই এই শর্তটির ব্যত্যয় ঘটেছে।

জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত ও অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি-৭১)

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনে মোট ১৫৪ কার্যদিবসের কার্যসূচিতে বিধি-৭১ এর অধীনে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষনের জন্য নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে মোট ৩০ কার্যদিবসে এই কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি কার্যদিবসে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশসমূহ টেবিলে উত্থাপিত হয়। বাকি ১২৩ কার্যদিবসে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১ম অধিবেশনের ১২টি, ২য় অধিবেশনে তিনটি, ৩য় অধিবেশনের পাঁচটি, ৪র্থ অধিবেশনের দুইটি, ৫ম অধিবেশনের দুইটি, ৬ষ্ঠ অধিবেশনের চারটি, ৮ম অধিবেশনের একটি এবং ২০তম অধিবেশনের দুইটি বৈঠকে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন বিষয়ক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ৭ম অধিবেশন এবং ৯ম থেকে ২১তম অধিবেশনে অর্থাৎ, মোট ১৪টি অধিবেশনে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিষয়ক কোনো আলোচনা সংসদে সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়নি। ৭১

(ক) ও (খ) বিধিতে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন বিষয়ক কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট যা সংসদের কার্যক্রমসমূহে ব্যয়িত মোট সময়ে ২ দশমিক ৯ শতাংশ।

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম ২২টি অধিবেশনে প্রাপ্ত মোট নোটিশের সংখ্যা ১,৮৮০ টি। এর মধ্যে ১,০৫১টি[৮৩] নোটিশের বিষয়ে মাননীয় স্পিকার সংসদে সরাসরি উল্লেখ করেন যা মোট ১৪৫ জন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত। উক্ত নোটিশসমূহের মধ্যে ৭৯ শতাংশ (৮৩১টি) সরকারি দলের ১১৯ জন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত, ১৫ শতাংশ (১৫৫টি) প্রধান বিরোধী দলের ১৬ জন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত এবং ৬ শতাংশ (৬৫টি) অন্যান্য বিরোধী দলের নয়জন সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত। নোটিশসমূহের মধ্যে মোট ১৬৩টি নোটিশ ৩০ জন নারী সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত যার মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ছিল মোট পাঁজজন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য ছিল ২৫ জন।[৮৪]

প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারি দলের মাত্র ৩৮ শতাংশ সদস্য নোটিশ প্রদান করেছে যেখানে বিরোধী দলের ৬২ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধীদলের ৭৫ শতাংশ জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নোটিশ প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য/আসন প্রতি নোটিশ প্রদানের সংখ্যা যথাক্রমে ২ দশমিক ৬টি, ৬টি এবং ৫ দশমিক ৫টি। নারী ও পুরুষের অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষ সদস্যদের ৪১ শতাংশ এবং নারী সদস্যদের ৪৩ শতাংশ নোটিশ প্রদান করেছে যেখানে ২৬ শতাংশ ছিল সরাসরি নির্বাচিত এবং ৫০ শতাংশ ছিল সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য।

চিত্র ৫.৭: দলভিত্তিক ও সদস্যপ্রতি নোটিশ প্রদানের হার

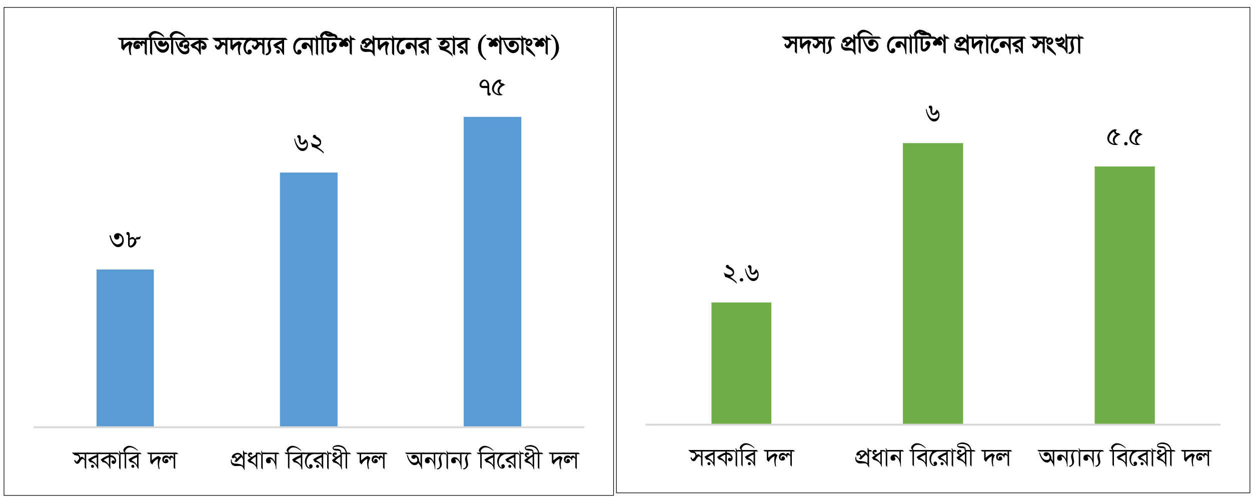

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণে প্রাপ্ত নোটিশসমূহের মধ্যে ৭১ (ক)[৮৫] বিধিতে মোট ৪২৫টি নোটিশের ওপর নোটিশদাতা সদস্যরা প্রত্যেকে দুই মিনিট করে বক্তব্য প্রদান করেন। মোট ৫২ জন সদস্য কর্তৃক নোটিশসমূহ উত্থাপিত ও উপস্থাপিত হয়। উক্ত নোটিশসমূহের মধ্যে ৩৪৪টি সরকারি দলের ৪২ জন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত ও উপস্থাপিত হয়, ৫৯টি প্রধান বিরোধী দলের ছয়জন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত ও উপস্থাপিত হয় এবং ২২টি অন্যান্য বিরোধী দলের চারজন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত ও উপস্থাপিত হয়। নোটিশসমূহের মধ্যে মোট ৩৫০টি (৮২.৪ শতাংশ) নোটিশ পুরুষ সংসদ সদস্য কর্তৃক এবং ৭৫টি (১৭.৬ শতাংশ) নোটিশ নারী সংসদ সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নারী সংসদ সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত নোটিশসমূহের মধ্যে আটটি নোটিশ ছিল সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যদের এবং ৬৭টি নোটিশ ছিল সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের।

আলোচিত নোটিশসমূহ মোট ৩৫টি মন্ত্রণালয় বিষয়ক ছিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নোটিশ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। এই মন্ত্রণালয় বিষয়ক মোট ৬৪টি (১৫.১ শতাংশ) নোটিশ আলোচিত হয়। এরপরে রয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উক্ত মন্ত্রণালয়ের মোট ৫৭টি (১৩.৪ শতাংশ) নোটিশ আলোচিত হয়। সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে ৪৯টি (১১.৫ শতাংশ) এবং ৪৭টি (১১.১ শতাংশ) নোটিশ উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩১টি (৭.৩ শতাংশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৪টি (৫.৬ শতাংশ), রেলপথ

[৮৩] এখানে ৩য় অধিবেশনের ১৮তম বৈঠকে প্রাপ্ত মোট নোটিশের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত নেই। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সংসদ অধিবেশনের ভিডিও ফুটেজ হতে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৮

[৮৪] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ১৯

[৮৫] কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ (১) বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কিন্তু, ৭১ (৩) অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব নয় এমন নোটিশসমূহ।

মন্ত্রণালয়ের ১৮টি (৪.২ শতাংশ) এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৬টি (৩.৮ শতাংশ) নোটিশ আলোচিত হয়। এছাড়া আরো ২৭টি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ নয় থেকে হতে সর্বনিম্ন একটি পর্যন্ত নোটিশ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৮৬]

১ম থেকে ২২তম অধিবেশনে মোট ২৯টি কার্যদিবস ৭১ বিধির গৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনার জন্য নির্ধারিত ছিল যার মধ্যে ২০ কার্যদিবসে গৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশনের ১৪ কার্যদিবস, ২য় ও ৩য় অধিবেশনের তিনটি করে কার্যদিবস, ৪র্থ ও ৫ম অধিবেশনের একটি করে কার্যদিবস, ৬ষ্ঠ অধিবেশনের পাঁচ কার্যদিবস এবং ২০তম অধিবেশনের দুই কার্যদিবস ৭১ বিধির গৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনার জন্য নির্ধারিত ছিল। আট কার্যদিবসে নির্ধারিত কার্যক্রম হতে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয় যার মধ্যে ১ম অধিবেশনের ছয়টি, ২য় অধিবেশনের দুইটি এবং ৬ষ্ঠ অধিবেশনের একটি কার্যদিবস ছিল। উল্লেখ্য, ২য় অধিবেশনের ৫ম দিনে নোটিশদাতা সদস্যদের প্রত্যেকেই অনুপস্থিত থাকার কারণে উক্ত দিনের নির্ধারিত আলোচনা কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনে গৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মোট ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

৭১ বিধিতে প্রদত্ত নোটিশসমূহের মধ্যে মোট গৃহীত নোটিশের সংখ্যা ৫০টি। তার মধ্যে সংসদে আলোচিত হয়েছে মোট ৪২টি (৮৪ শতাংশ) নোটিশ। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নোটিশ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। উক্ত মন্ত্রণালয়ের মোট ছয়টি নোটিশের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচিত নোটিশের সংখ্যার দিক থেকে এরপরে রয়েছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। উভয় মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি করে নোটিশ আলোচিত হয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে চারটি ও তিনটি নোটিশের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ, সড়ক পরিবহন ও সেতু, মৎস ও প্রাণী সম্পদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, নৌ পরিবহন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিটিতে দুইটি করে নোটিশ আলোচনা হয়। এছাড়া শিল্প, খাদ্য, কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বস্ত্র ও পাট, রেল যোগাযোগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটিতে একটি করে নোটিশ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৮৭]

মোট ৩৮ জন সদস্য কর্তৃক গৃহীত নোটিশ উপস্থাপিত হয়। যার মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ৩৩ জন (৮৬.৮ শতাংশ) এবং নারী সদস্য ছিলেন পাঁচজন (১৩.২ শতাংশ)। গৃহীত নোটিশসমূহের মধ্যে ৩৮টি (৭৬ শতাংশ) নোটিশ সরকারি দলের, ১১টি (২২ শতাংশ) নোটিশ প্রধান বিরোধী দলের এবং একটি (২ শতাংশ) নোটিশ অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। সরকারি দলের পক্ষ হতে উত্থাপিত নোটিশসমূহ মোট ৩০ জন সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয় যার মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিলেন ২৬ জন (৮৬.৭ শতাংশ) এবং নারী সদস্য ছিলেন চারজন (১৩.৩ শতাংশ)। প্রধান বিরোধী দলের নোটিশসমূহ উপস্থাপিত হয় সাতজন সদস্য কর্তৃক যার মধ্যে পুরুষ সদস্য ছিল ছয়জন (৮৫.৭ শতাংশ) এবং নারী সদস্য ছিল একজন (১৪.৩ শতাংশ)। অন্যান্য বিরোধী দল কর্তৃক উপস্থাপিত একটি নোটিশ উপস্থাপিত হয় একজন পুরুষ সদস্য কর্তৃক।

সারণি ৫.৩: ৭১ (খ) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলভিত্তিক উত্থাপিত নোটিশের সংখ্যা

দল	নোটিশদাতার সংখ্যা		নোটিশের সংখ্যা	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সরকারি দল	৪	২৬	৫	৩৩
প্রধান বিরোধী দল	১	৬	১	১০
অন্যান্য বিরোধী দল	১	০	০	১

মোট গৃহীত নোটিশের মধ্যে ১৫টি নোটিশের ওপর আলোচনা প্রাথমিক অবস্থায় স্থগিত ছিল। নোটিশদাতা কোনো সদস্য প্রস্তুত না থাকায়, নোটিশদাতা সদস্যের অনুরোধে, নোটিশদাতা সদস্য অনুপস্থিত থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুরোধজনিত কারণে উক্ত নোটিশসমূহের আলোচনা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সাতটি নোটিশ অন্য কার্যদিবসে গৃহীত নোটিশসমুহের আলোচনা কার্যক্রমে আলোচিত হয়। বাকি আটটি (১৬ শতাংশ) নোটিশের আলোচনা পরবর্তীতে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশদাতা সদস্য অনুপস্থিত থাকার কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুইটি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি নোটিশ স্থগিত হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের অনুরোধে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি করে নোটিশ স্থগিত রাখা হয়।[৮৮]

[৮৬] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২০
[৮৭] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২১
[৮৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২২

বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বিষয়ক আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের মোট ১৩ কার্যদিবসে বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত ছিল। তার মধ্যে ২টি অধিবেশনে এই কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয় এবং ১১ কার্যদিবসে মোট ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা সংসদে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ১ দশমিক ৫ শতাংশ সময়। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ অধিবেশনে এই আলোচনাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ম থেকে ২২তম অধিবেশনে বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বিষয়ক কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই পর্বে উপস্থাপনীয় প্রস্তাবের সংখ্যা ছিল মোট ৫৫টি যার মধ্যে ৩৬টি (৬৫ শতাংশ) প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ৩৪টি (৬২ শতাংশ) প্রস্তাব প্রস্তাবকারী সদস্যদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে দুইটি (৬ শতাংশ) প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বাকি ৩২টি (৯৪ শতাংশ) প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।[৮৯] ৫৫টি নোটিশের মধ্যে যে ১৯টি নোটিশ উপস্থাপিত হয়নি এবং উপস্থাপিত ৩৬টি মধ্য থেকে যে দুইটি নোটিশ আলোচিত হয়নি তার প্রত্যেকটিই সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবকারীদের অনুপস্থিতির কারণে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়নি। উপস্থাপিত যে দুইটি নোটিশের আলোচনা স্থগিত ছিল তা পরবর্তী কার্যদিবসে পুনরায় আলোচনার জন্য আহ্বান করা হলেও প্রস্তাব উত্থাপকদের অনুপস্থিতির কারণে তা পুনবায় স্থগিত করা হয়।

চিত্র ৫.৮: প্রস্তাবিত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সংখ্যা

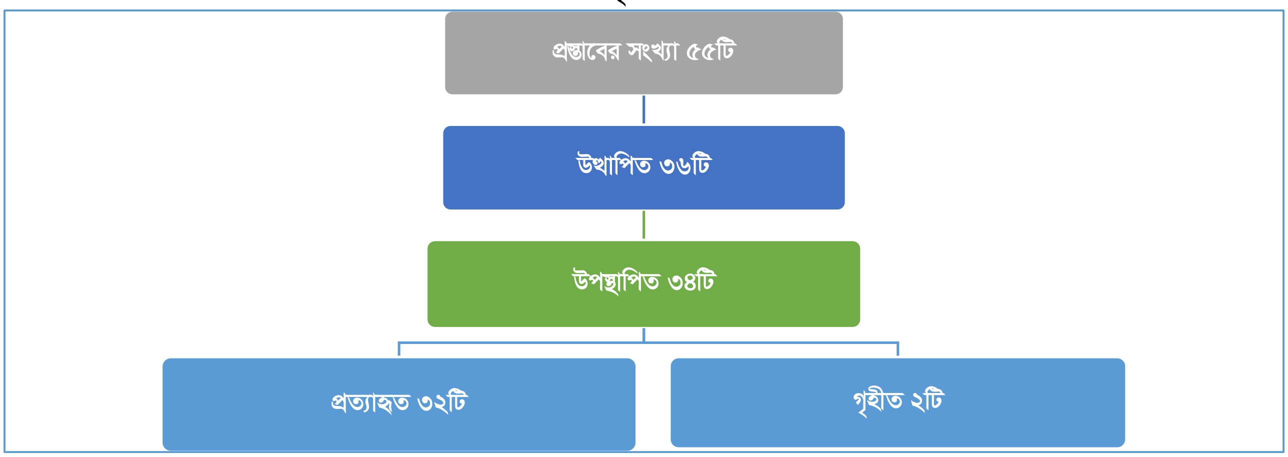

উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে ২৪টি (৭১ শতাংশ) প্রস্তাব সরকারি দল কর্তৃক, ছয়টি (১৮ শতাংশ) প্রস্তাব প্রধান বিরোধীদল কর্তৃক এবং চারটি (১২ শতাংশ) প্রস্তাব অন্যান্য বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ মোট ২৫ জন সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। যার মধ্যে ২০ জন (৮০ শতাংশ) ছিলেন সরকারি দলের সদস্য, একজন (৪ শতাংশ) ছিলেন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য এবং চারজন (১৬ শতাংশ) ছিলেন অন্যান্য প্রধান বিরোধীদলের সদস্য। নারী পুরুষের অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ ২৪টি (৯৬ শতাংশ) পুরুষ সদস্য কর্তৃক এবং একটি (৪ শতাংশ) নারী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিল উপস্থাপক একজন নারী সদস্য ছিলেন সরকারি দলের। প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী দলের কোনো নারী সদস্য কোনো সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেননি।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর মোট ২৭ জন সদস্য ২০৫ বার সংশোধনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ২৩ জন (৮৫ শতাংশ) পুরুষ সদস্য ১৫৫টি (৭৬ শতাংশ) এবং চারজন (১৫ শতাংশ) নারী সদস্য ৫০টি (২৪ শতাংশ) সংশোধনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দলীয় অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারি দলের মোট ২১ জন (১৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী), প্রধান বিরোধী দলের মোট চারজন (তিনজন পুরুষ ও একজন নারী) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের মোট দুইজন সদস্য (দুইজনই পুরুষ) যথাক্রমে ১৫০ টি (৭৩ শতাংশ), ৪৯টি (২৪ শতাংশ) ও ছয়টি (৩ শতাংশ) সংশোধনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সরকারি, প্রধান বিরোধী ও অন্যান্য বিরোধীদলের নারী ও পুরুষের সংশোধনী আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে, ১৯ শতাংশ ও ৮১ শতাংশ, ৪৩ শতাংশ ও ৫৭ শতাংশ এবং শূন্য শতাংশ ও ১০০ শতাংশ।

আলোচিত ৩৪টি প্রস্তাব মোট ১৪টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাব করা হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তাব ছিল সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে যথাক্রমে ছয়টি, পাঁচটি, চারটি, চারটি ও তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুইটি করে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি করে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

[৮৯] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৩

উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের বিষয়বস্তুগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। অবকাঠামো উন্নয়ন; রাস্তা, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ এবং জরুরি পদক্ষেপ বিষয়ক। ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ প্রস্তাব ছিল অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক, ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ প্রস্তাব ছিল রাস্তা, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ বিষয়ক এবং ২০ দশমিক ৫ শতাংশ প্রস্তাব ছিল জরুরি পদক্ষেপ বিষয়ক।

চিত্র ৫.৯: উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

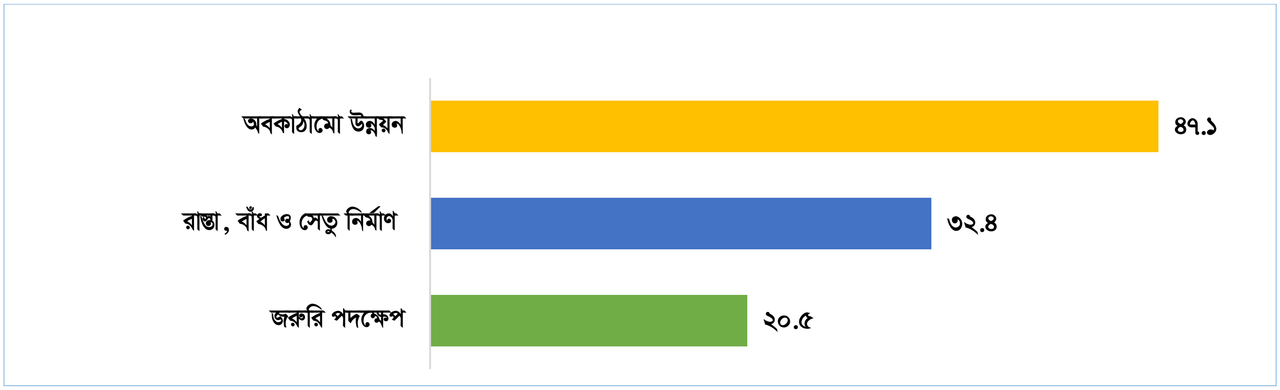

উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সে দুইটি প্রস্তাবই ছিল সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত। তার মধ্যে একটি প্রস্তাব প্রস্তাবকারী যেভাবে প্রস্তাব করেছেন তার অনুরূপভাবে এবং অন্যটি সংশোধনীসহ সংশোধিত আকারের গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবসমূহের একটি ছিল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবকৃত এবং অপরটি ছিল নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। গৃহীত প্রস্তাবসমূহ হলো-

- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-চলাচল রুটের যাত্রী সাধারণের জন্য নিরাপদ নৌযান এর ব্যবস্থা করা (প্রস্তাবের অনুরূপ)
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় একটি, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় দুইটি, কুমিল্লা জেলার কাপ্তানবাজার এলাকায় একটি, কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলায় একটি এবং বগুড়া জেলার শেরপুর ও ধুনট উপজেলাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত আকারে)

যে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহৃত হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল- নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও টেকসই বাঁধ স্লুইসগেট নির্মাণ; রাস্তা, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার; অবাকাঠামো নির্মাণ; আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেবার কার্যালয় স্থাপন; হাসপাতাল স্থাপন ও শয্যাবৃদ্ধিকরণ, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগে আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধিকরণ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ; তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ; সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা; প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ সম্প্রসারণ; প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন; স্থল বন্দর, অর্থনৈতিক জোন, শিশুপার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, আভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীতকরণ। প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহৃত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় সেগুলো হল- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতিমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদি।[৯০]

বিধি ১৬৩ এর ওপর আলোচনা

কার্যপ্রণালী বিধির ১৬৩ ধারা মোতাবেক ১৬৫ বিধির বিধান সাপেক্ষে, কোনো সদস্যের বা সংসদের বা সংসদের কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে কোনো সদস্য সংসদে প্রশ্ন তুলতে পারেন যা বিশেষ অধিকার প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।[৯১] একাদশ জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের হতে উক্ত বিধির অধীনে একটি নোটিশ গৃহীত হয়। দশম অধিবেশনের শেষ কার্যদিবসে অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য এই নোটিশটি উত্থাপন করেন। তবে নোটিশের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নোটিশটি স্পিকার খারিজ করে দেন।

বিধি ২৭৪ এর ওপর আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের হতে ২৭৪ ধারার অধীনে দুইটি বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। ১ম ও ৫ম অধিবেশনে এই বক্তব্য দুইটি উপস্থাপিত হয়। প্রথম বক্তব্যটি রাখেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী। এক প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির একজন সদস্য মাদক ব্যবসা

---

[৯০] বস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট

[৯১] বিস্তারিত দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৬৩ হতে ১৭১ ধারা।

ও সড়ক দুর্ঘটনাকে একই কাতারে ফেলে মন্তব্য করলে তার প্রতিবাদে তিনি ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। কার্যপ্রণালী বিধির ২৭৪ ধারা মোতাবেক স্পিকারের অনুমতি নিয়ে কোনো সদস্য কোনো বিষয়ে ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দানের জন্য বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে কোনো বিতর্কমূলক বিষয় উত্থাপন করা যাবে না বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে।[৯২] শর্ত থাকা সত্ত্বেও, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে গিয়ে নিজের দল ও স্বপদে নিজের অর্জন উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রধান বিরোধীদলের সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় বক্তব্যটি রাখেন প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য। সংসদের বাইরে তার একটি বক্তব্যে পরোক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রী ও জাতির পিতার সমালোচনার প্রসঙ্গ উঠলে তিনি জানান তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কটুক্তি করেননি এবং কোনো ভুল ত্রুটি তার বক্তব্যে হয়ে থাকলে তিনি তার জন্য নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করেন।

মুলতবি প্রস্তাব

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের মধ্যে পাঁচটি অধিবেশনে মোট ২২টি নোটিশ ৬২ বিধির অধীনে পাওয়া যায়। ১ম, ২য়, ৫ম, ৭ম হতে ১৪তম, ১৬তম হতে ১৮তম এবং ২০তম হতে ২২তম অধিবেশনে কোনো মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। ৩য় অধিবেশনে তিনটি, ৪র্থ অধিবেশনে ১৫টি, ৬ষ্ঠ অধিবেশনে দুইটি এবং ১৫তম ও ১৯তম অধিবেশনে একটি করে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত ২২টি নোটিশের মধ্যে তিনটি নোটিশ প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক এবং বাকি ১৯ টি নোটিশ অন্যান্য বিরোধীদলের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত নোটিশের অধিকাংশ নোটিশই এসেছে অন্যান্য বিরোধীদলের একজন নারী সদস্য হতে। মোট ২২টি নোটিশের মধ্যে ১৪টি (৬৩.৬ শতাংশ) নোটিশই তিনি উত্থাপন করেছেন এবং বাকি আটটি (৩৬.৪ শতাংশ) নোটিশ মোট চারজন পুরুষ সদস্য উত্থাপন করেছেন। উত্থাপিত নোটিশসমূহের বিষয়বস্তু ছিল বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্রুত নির্বাচন আয়োজন, দলীয় প্রতিহিংসামূলক আচরণ বন্ধ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উর্ধ্বগতি রোধ, সংখ্যা লঘু, নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আশু করণীয়, ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ প্রতিরোধে করণীয় ও রাজধানী স্থানান্তর, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, চিকিৎসাসেবার মান বৃদ্ধি, বিদেশে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা ইস্যু এবং আসামের এনআরসি ইস্যু। কার্যপ্রণালী বিধির ৬৩ ধারা অনুযায়ী অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা বা ইতোমধ্যে অন্য পর্বে আলোচনা হওয়া বা উক্ত ধারায় উত্থাপনের অধিকারের সীমাদ্ধতার মধ্যে পড়ে যাওয়ায় স্পিকার কর্তৃক নোটিশগুলো বাতিল হয়ে যায়।

মূলতবী প্রস্তাবের বিষয়বস্তুগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা প্রস্তাব, সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ক আলোচনা প্রস্তাব, বিএনপি নেতীকর্মীদের মুক্তি বিষয়ক আলোচনা প্রস্তাব, করোনা ও চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা প্রস্তাব, নারী প্রসঙ্গে আলোচনা প্রস্তাব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা প্রস্তাব। প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ প্রস্তাব ছিল গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে, ২২ দশমিক ৭ শতাংশ প্রস্তাব ছিল সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে, ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ প্রস্তাব ছিল বিএনপি নেতীকর্মীদের মুক্তি বিষয়ে, ৯ দশমিক ১ শতাংশ প্রস্তাব ছিল করোনা ও চিকিৎসা বিষয়ে, ৯ দশমিক ১ শতাংশ প্রস্তাব ছিল নারী প্রসঙ্গে এবং ৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রস্তাব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রসঙ্গে।[৯৩]

চিত্র ৫.১০: মুলতবি প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (শতাংশ)

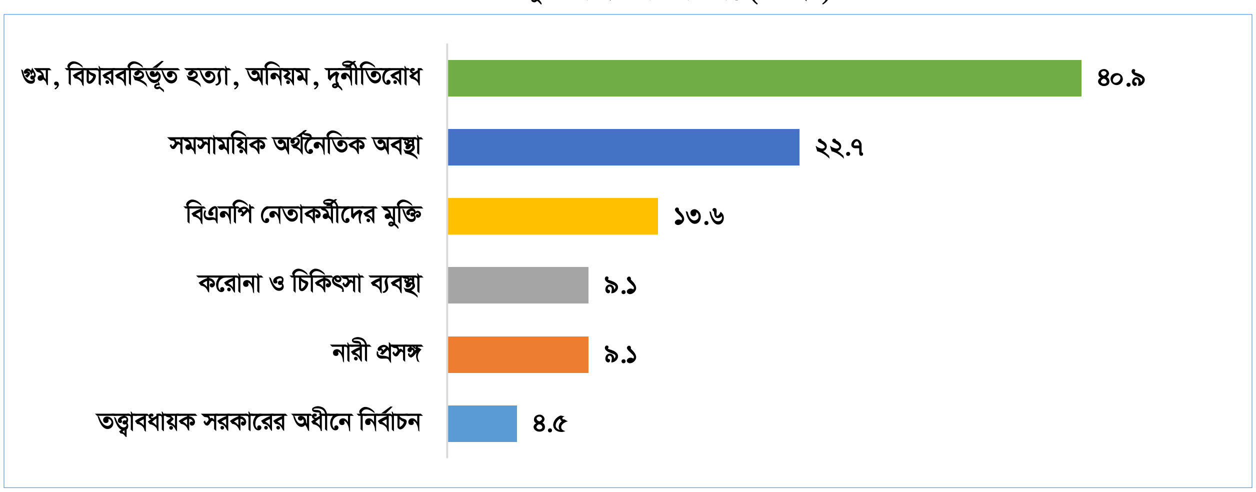

[৯২] বিস্তারিত দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৪ ধারা।

[৯৩] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৪

৩০০ বিধিতে বক্তব্য

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে দ্বাবিংশ অধিবেশনে মোট ১৩ কার্যদিবসে মন্ত্রীগণ ৩০০ বিধিতে বক্তব্য রাখেন। ১ম, ৫ম, ও ১৮তম অধিবেশনের দুইটি করে বৈঠকে এবং ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ, ১৬শ, ১৯শ ও ২২শ অধিবেশনের প্রত্যেকটিতে একটি করে বৈঠকে মোট ১৪টি বিষয়ে ৩০০ বিধির ওপর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে অর্থ, রেলপথ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেকে দুইটি করে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেকে একটি করে বক্তব্য প্রদান করে।[৯৪] ৩০০ বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য প্রদান বিষয়ক কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় দুই ঘণ্টা ১৯ মিনিট। অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী দলের যথাক্রমে দুইজন, দুইজন ও একজন সদস্য যথাক্রমে দুইটি, সাতটি ও দুইটি করে মোট ১১টি বিষয়ের ওপর বিবৃতি রাখার দাবি উত্থাপন করেন। এর মধ্যে সরকার দলের উত্থাপিত দাবিগুলো হতে একটি এবং প্রধান বিরোধী দলের উত্থাপিত দাবিগুলো হতে একটি বিষয়ের ওপর মন্ত্রীগণ বিবৃতি রাখলেও বাকি নয়টি বিষয়ের ওপর কোন বিবৃতি প্রদান করেননি।

জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থায়ী কমিটিগুলো দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে সহয়তা করে। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে যেমন নির্বাহী বিভাগের কাজের পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিকল্প নির্দেশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের পার্লামেন্টও তত বেশি গতিশীল ও সফল। সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলানো হয়। সংবিধানের ৭৬ ধারায় সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয় বর্ণিত আছে।[৯৫] এছাড়া কার্যপ্রণালী বিধিতেও এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।[৯৬] এ অংশে একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের সময়কালে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

দশম সংসদের মতো একাদশ সংসদেও প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি (৫০টি) গঠন করা হয়। সংসদের মোট ৩০৯[৯৭] জন সদস্য ৫০টি কমিটির সদস্য। কমিটিতে সরকারি দলের সদস্য রয়েছেন মোট ২৭১ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য রয়েছে মোট ২৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য রয়েছে মোট ১২ জন । কমিটিতে পুরুষ সদস্য রয়েছে মোট ২৪১ জন এবং নারী সদস্য রয়েছে মোট ৬৮ জন। ৫০টি কমিটির মধ্যে সরকারি দল হতে সভাপতি রয়েছেন ৪৬টি কমিটি এবং বিরোধী দল হতে সভাপতি রয়েছেন ৪টি কমিটিতে। কমিটিগুলো হলো সরকারি হিসাব, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সড়ক পরিবহন এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। ৫০টি কমিটির মধ্যে ১৭টি কমিটিতে বিরোধীদলীয় কোন সদস্য নাই।

কমিটির সদস্যপদ বিন্যাস হতে দেখা যায়, সংসদের ৪০ জন সদস্য কোন কমিটির সদস্য নন। অন্যদিকে, সরকারি দলের একজন সদস্য সর্বোচ্চ সাতটি কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন এবং ছয়জন সদস্য চারটি করে কমিটির সদস্য। মোট ১১৭ জন সদস্য একাধিক কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন। দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে যার ফলে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।[৯৮]

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[৯৯] সে হিসেবে বিধি অনুযায়ী প্রতিটি (৫০টি) কমিটির প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি করে ৪৮ মাসে মোট ২৭০০টি সভা করার কথা। সেখানে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মোট ১১৮৭টি। ন্যূনতম নির্ধারিত সংখ্যক সভার ৬৬ দশমিক ১ শতাংশ অনুষ্ঠিত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, কোনো কমিটিই প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম পালন করেনি। কমিটিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মোট ১১৭টি সভা করেছে। সর্বনিম্ন সংখ্যক সভা করেছে বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি। উক্ত কমিটি মোট নয়টি সভা করেছে এই সময়ের মধ্যে। তিনটি কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কমিটিগুলো হলো কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

---

[৯৪] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৫

[৯৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭৬

[৯৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬

[৯৭] পদাধিকার বলে প্রাপ্ত কমিটির সদস্যপদ বিবেচনা করা হয়নি

[৯৮] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, স্বরাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, শিল্প, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লেখযোগ্য।

[৯৯] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

৪৮ মাসের মধ্যে পিটিশন কমিটি একটি সভাও করেনি। অন্যদিকে ২০১৯ সালে স্কটল্যান্ড সংসদের[১০০] এবং ভারতের লোকসভা'র[১০১] সংসদীয় পিটিশন কমিটি কর্তৃক যথাক্রমে ৩৬টি ও পাঁচটি পিটিশনকৃত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংসদে উত্থাপিত বিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধান চেয়ে যেকোনো নাগরিক পিটিশন কমিটিতে আবেদন করতে পারেন। জনগণের সাথে সংসদের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এই কমিটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা বর্তমানে কার্যকরতা হারিয়েছে। দশম সংসদে এই কমিটি দুইটি সভা করেছে। সংসদ সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, পিটিশন কমিটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিকার পাওয়ার একটি নজির রয়েছে যা দীর্ঘ দশ বছর আগের ঘটনা।[১০২] তবে কমিটির বৈঠকের ক্ষেত্রে অষ্টম ও নবম সংসদেও একই বাস্তবতা লক্ষ করা যায়।

করোনাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর নিয়মিত সভার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। করোনা মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট আটটি মন্ত্রণালয়ের করোনাকালে নিয়মিত মাসিক বৈঠকের সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি করোনাকালীন ১৮ মাসের[১০৩] মধ্যে মোট পাঁচ মাসে বৈঠক করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ। করোনার শুরুতে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বৈঠক করার পর পরবর্তী আট মাসে তারা আর কোন সভা করেনি। ২০২০ সালের ডিসেম্বর ও ২০২১ সালে জানুয়ারি মাসের পরও টানা চার মাস এই মন্ত্রণালয়ের কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে মোট ১০ মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ। করোনার শুরুতে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বৈঠক করার পর পরবর্তী চার মাসে তারা আর কোনো সভা করেনি। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হলেও এরপর টানা চার মাস কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে মোট চার মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ২২ দশমিক ২ শতাংশ। করোনার শুরুতে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বৈঠক করার পর পরবর্তী নয় মাসে তারা আর কোন সভা করেনি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর টানা তিন মাস এবং ২০২১ সালের জুন মাসের পর টানা দুই মাস কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে মোট পাঁস মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ। করোনা শুরুর পর ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে বৈঠক করার পর পরবর্তী চার মাসে তারা আর কোনো সভা করেনি। ২০২০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীতে ২০২১ এর এপ্রিল হতে আগস্ট পর্যন্ত টানা পাঁস মাস কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে মোট তিন মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২০ সালের মার্চ, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর এই তিন মাস ব্যতিত বাকি কোনো মাসে এই কমিটি কোনো সভা করেনি। ২০২১ সালে এই কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে মাত্র এক মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে ছয় মাসে সভা করেছে, যা ন্যূনতম একটি মাসিক সভার শর্তের ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ। করোনার শুরুতে টানা ছয় মাস এই কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২১ সালের মার্চের পরও টানা চার মাস এই কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই সময়কালে একটি সভাও করেনি।

[১০০] https://www.parliament.scot/gettinginvolved/petitions/ViewPetitions.aspx

[১০১] http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=22&tab=2

[১০২] পঞ্চম সংসদ থেকে পিটিশনে বিধান চালু হয়। তার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪৯টি পিটিশন জমা পড়লেও গৃহীত হয়েছে ২০টি যার মধ্যে পঞ্চম সংসদে ১৭টি, সপ্তম সংসদে দুইটি এবং অষ্টম সংসদে একটি। নবম সংসদে ১২টি পিটিশন জমা পড়লেও কোনটি গৃহীত হয়নি এমনকি কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। তথ্যসূত্র: *http://bangle.bdnews24.com/Bangladesh/article967916.bdnews*

[১০৩] করোনাকাল বলতে করোনা বিস্তারের ৩টি ধাপের ১৮ মাসকে বোঝানো হয়েছে, (২০২০ সালের মার্চ মাস হতে ২০২১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত)

সারণী ৫.৪: করোনাকালে সংশ্লিষ্ট কিছু স্থায়ী কমিটির মাসিক সভার বিন্যাস[১০৪]

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	২০২০ মার্চ	২০২০ এপ্রিল	২০২০ মে	২০২০ জুন	২০২০ জুলাই	২০২০ আগষ্ট	২০২০ সেপ্টে.	২০২০ অক্টো.	২০২০ নভে.	২০২০ ডিসে.	২০২১ জানু.	২০২১ ফেব্রু	২০২১ মার্চ	২০২১ এপ্রিল	২০২১ মে	২০২১ জুন	২০২১ জুলাই	২০২১ আগষ্ট	ন্যুনতম ১টি সভা হওয়া মাস: সংখ্যা	ন্যুনতম ১টি সভা হওয়া মাস: শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	✓									✓	✓					✓		✓	৫	২৭.৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	১০	৫৫.৬
সমাজ কল্যাণ	✓										✓	✓				✓			৪	২২.২
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান		✓					✓	✓			✓		✓						৫	২৭.৮
অর্থ																			০	০
খাদ্য	✓						✓			✓									৩	১৬.৭
বাণিজ								✓											১	৫.৬
স্বরাষ্ট্র							✓		✓	✓	✓		✓					✓	৬	৩৩.৩

কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, সভা প্রতি গড়ে উপস্থিত ছিল ৬০ শতাংশ সদস্য। সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভায়। এই কমিটির সভাগুলোতে গড়ে ৮২ শতাংশ সদস্য উপস্থিত ছিল। সর্বনিম্ন উপস্থিতি ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভায়, গড়ে ৪৬ শতাংশ সদস্য উপস্থিত ছিল কমিটির সভাগুলোতে।

মোট ৩১টি কমিটির ৪৮টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির একটি, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পাঁচটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির একটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চারটি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুইটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তিনটি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির তিনটি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯টি কমিটির কোনো প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। কমিটিগুলো হচ্ছে, কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পিটিশন কমিটি, লাইব্রেরী কমিটি, সংসদ কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

সংসদে উপস্থাপিত ১৯টি কমিটির মোট ২৬টি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী কমিটি হতে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ছিল ৫১ শতাংশ, অজ্ঞাত বা অবাস্তবায়িতের হার ৪ শতাংশ এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন ও চলমান রয়েছে। সার্বিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যায় যে, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। কমিটি হতে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকলেও এই বিষয়টি গুরুত্বে সাথে বিবেচিত হয় না এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে জবাবদিহি করার চর্চাও অনুপস্থিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

[১০৪] সবুজ রং দ্বারা ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বোঝানো হয়েছে এবং লাল রং দ্বারা একটিও সভা অনুষ্ঠিত হয়নি বোঝানো হয়েছে।

"...কমিটির সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এমনকি বাস্তবায়নের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অনেক সদস্যই জানেন না... সুপারিশ বাস্তবায়ন ফলো-আপের জন্য কোনো সেলফ এক্সিকিউশন মেশিনারি নেই যার মাধ্যমে সুপারিশ বাস্তবায়ন না হলে সংশ্লিষ্টদেরকে ডাকা হবে অথবা সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে..."

সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে একজন সংসদ বিশেষজ্ঞ বলেন,

"কমিটিগুলোর ফরমেশন মূলত সংসদের মতোই। এখানেও সরকারি দলের একচ্ছত্র প্রভাব। ফলে এই ফরমেশনে থেকে কে কাকে জাবাবদিহি করবে।"

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করা এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য যে কাউকে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করতে পারে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দলিলসহ সাক্ষী তলবের ক্ষমতা দিয়ে নতুন আইন করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত এই আইনে সংসদীয় কমিটিকে অনুসন্ধান ও তদন্তকাজে দেওয়ানি আদালতের (কোড অব সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮) ক্ষমতার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেকোনো ধরনের নথি বা দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারির ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সংসদীয় কমিটি অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ এখনও ফাইলবন্দি হয়ে আছে। সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করলেও তা দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে আছে। নবম সংসদে বিলটি উত্থাপন ও পাস হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। দশম জাতীয় সংসদেও বিলটি আলোর মুখ দেখেনি। একাদশ সংসদে দেখবে কিনা তাও অনিশ্চিত। বিলটি পাস হলে সংসদীয় কমিটিতে যাকে তলব করা হবে তিনি বৈঠকে হাজির হতে বাধ্য থাকবেন। আর হাজির না হলে তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি ও শাস্তির সুপারিশ করতে পারবে সংদীয় স্থায়ী কমিটি। শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সংসদের একাধিক কমিটির সভাপতির মতে, মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থেই বিলটি পাস করা উচিত। তা না হলে অতীতের মতো এবারও নিষ্ক্রিয় থেকে যাবে সংসদীয় কমিটিগুলো।[১০৫]

সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের ভূমিকা

সার্বিকভাবে একাদশ জাতীয় সংসদে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে প্রধান বিরোধীদলের অবস্থান ছিল প্রান্তিক। এছাড়া নির্বাচনকালীন মহাজোটের একটি দল হওয়ায় সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের জোড়ালো ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল অতি সতর্কতার সাথে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। দলের কয়েকজন সদস্য কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা লক্ষনীয় হলেও বাকি সদস্যরা এক্ষেত্রে অনেকাংশে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকার প্রধান ও সরকারের প্রশংসায় ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মতোই বক্তব্য প্রদান করেছেন এ দলের সদস্যরা। সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকারদলীয় নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে সমর্থন করায় প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা ও পরিচয়ের সংকট লক্ষ্য করা গেছে। সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ হতে সমর্থন চাওয়ার নজিরও দেখা গেছে। প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য তার বক্তব্যে বলেন,

"সরকারের যত কৃতিত্ব এর পিছনে জাতীয় পার্টির একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো নেতা একবারও আমাদের নাম উচ্চারণ করে না। আমরা কিন্তু হাজার বার উচ্চারণ করি যে, এই সরকারের আমলে এটা হইছে। আমাদের সেটা আছে, তাদের সেটা নাই। এত কার্পণ্য কেন রাজনীতিতে! এটা গণতন্ত্রের ভাষা না..."

সরকারকে জবাবদিহি করার পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য বিরোধী দলের পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে। সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা সার্বিকভাবেই ছিল গৌন। অন্যান্য বিরোধীদলসমূহের সাথেও পারস্পরিক মেল বন্ধন না থাকায় সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্র এখানে আরও সীমিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবি করে প্রথমে শপথ না নিলেও পরে সংসদে যাওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং গণফোরাম-এর সংসদ সদস্যরা অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে তুলনামূলকভাবে জোড়ালো ভূমিকা পালন করেছেন। সংখ্যায় স্বল্প হলেও আইন

[১০৫] দৈনিক যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০১৪।

প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, অনির্ধারিত আলোচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বক্তব্য প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান তুলে ধরা এবং সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং এ কারণে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সদস্যদের কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের সময় সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকেও প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিরোধী একজন সংসদ সদস্য সংসদে তার বক্তব্যে বলেন,

> *"আমাকে লড়তে হচ্ছে ৩৪০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে। ছয় বছর কার্যত বিরোধী দল না থাকার ফল এটাই হয়েছে যে সরকার এখন ন্যূনতম সমালোচনাও শুনতে পারছে না। সরকারি দলের সদস্যদের অসহিষ্ণুতা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে।"*

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমানে প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষের সংখ্যা ৯৯ জনের মতো।[১০৬] অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক দিয়ে নারীদের সংখ্যা বাংলাদেশের জনগণের অর্ধেকের থেকেও কিছুটা বেশি। দেশের অর্ধেক বা অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠীকে পশ্চাতে রেখে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে দেশের সকল নাগরিকদের সমঅধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি উল্লেখিত রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। পরিচয়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কারো প্রতি কোন বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।[১০৭] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্য ৫-এ লিঙ্গীয় সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে বলা হয়েছে।[১০৮] এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) এর ২০০৯ সালের সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত ধারায় বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ে মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।[১০৯] রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং নারী অধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও এ সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে দুই ধরনের আসন হতে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসন। সংরক্ষিত আসনসমূহ নারীদের জন্য নির্ধারিত থাকে, মনোনয়নের মাধ্যমে এর সদস্য নির্ধারণ হয়ে থাকে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে সংরক্ষিত আসনসমূহ বণ্টিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে সরাসরি নির্বাচিত আসনগুলো হতে নারী অথবা পুরুষ যেকোনো প্রার্থী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতেই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ছিল। যা শুরুতে ছিল ১৫ জন এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি হয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে হয় ৫০ জন।

সারণি ৬.১: জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের হার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য		সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য	মোট নারী সদস্যের সংখ্যা	সংসদে মোট আসন সংখ্যা	নারী সদস্যদের শতকরা হার	
	পুরুষ	নারী				নির্বাচিত	মোট
প্রথম	৩০০	-	১৫	১৫	৩১৫	০.০	৪.৮
দ্বিতীয়	২৯৮	২	৩০	৩২	৩৩০	০.৭	৯.৭
তৃতীয়	২৯৫	৫	৩০	৩৫	৩৩০	১.৭	১০.৬
চতুর্থ	২৯৬	৪	৩০	৩৪	৩৩০	১.৩	১০.৩
পঞ্চম	২৯৪	৬	৩০	৩৬	৩৩০	২.০	১০.৯
ষষ্ঠ	২৯৭	৩	৩০	৩৩	৩৩০	১.০	১০.০
সপ্তম	২৯২	৮	৩০	৩৮	৩৩০	২.৭	১১.৫
অষ্টম	২৯৩	৭	৪৫	৫২	৩৪৫	২.৩	১৫.১
নবম	২৭৯	২১	৫০	৭১	৩৫০	৭.০	২০.৩
দশম	২৭৮	২২	৫০	৭২	৩৫০	৭.৩	২০.৬
একাদশ	২৭৭	২৩	৫০	৭৩	৩৫০	৭.৭	২০.৯

সরাসরি নির্বাচিত আসনে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য নয়। একাদশ জাতীয় সংসদে মোট ৭৩ জন নারী সদস্যের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য ২৩ জন অর্থাৎ মোট ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে নারী সদস্য রয়েছে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। সংরক্ষিত আসন ছাড়া এবং সংরক্ষিত আসনসহ উভয়ক্ষেত্রেই সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার এযাবৎকালে অনুষ্ঠিত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রথম জাতীয় সংসদে কোনো নারী সদস্য নির্বাচিত হননি (তখন কোনো নারী সদস্য মনোনয়ন দেওয়া হয়নি)। দ্বিতীয় সংসদে দুইজন, ৩য় সংসদে পাঁচজন, ৪র্থ সংসদে চারজন, ৫ম সংসদে চারজন, ৬ষ্ঠ সংসদে তিনজন, ৭ম সংসদে আটজন, ৮ম সংসদে সাতজন, ৯ম সংসদে ২১ জন এবং ১০ম সংসদে ২২ জন নারী সদস্য

[১০৬] বিস্তারিত দেখুন, http://www.bbs.gov.bd/

[১০৭] বিস্তারিত দেখুন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৯(১), ২৯(২)

[১০৮] বিস্তারিত দেখুন, https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

[১০৯] বিস্তারিত দেখুন, The representation of the people order, 1972

সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাধারণ আসন লাভ করেন। [১১০] নবম জাতীয় সংসদ হতে চলমান একাদশ সংসদ পর্যন্ত সংসদে আসনের দিক দিয়ে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ে মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার শর্ত হতে এখনও অনেক কম।[১১১]

একাদশ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম হতে দ্বাবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা মোট ৭৩ জন যাদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য ২৩ জন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ৫০ জন। সরাসরি আসনে মোট ১৮৪৮ জন প্রার্থী মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ৬৯ জন (৩.৭ শতাংশ), তাদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছে মোট ২৩ জন। অর্থাৎ প্রার্থীতার বিপরীতে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার ছিল ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ। নির্বাচিত আসনের নারী সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ২১ জন এবং প্রধান বিরোধী দলের দুই জন। অন্যান্য দল হতে কোনো নির্বাচিত নারী সদস্য নেই। সংরক্ষিত আসনের আনুপাতিক হারে বণ্টিত আসনসমূহের মধ্যে সরকারি দলের আসন সংখ্যা ৪৪টি (আওয়ামীলীগ ৪৩টি এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি একটি), প্রধান বিরোধী দলের আসন সংখ্যা চারটি (জাতীয় পার্টি চারটি) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের আসন সংখ্যা দুইটি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জোটভুক্ত হয়ে একটি)। এই সংসদে নারী সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছিল যথাক্রমে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, ১১ দশমিক ১ শতাংশ ও ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২৩-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারীর ক্ষমতায়নে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম তবে লিঙ্গীয় সমতা রক্ষায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যে বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীরা কতটা এগিয়েছে তা বিশ্লেষণে এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়, বাংলাদেশের অবস্থান এই ক্ষেত্রে সপ্তম। তিনটি বিষয়ের ওপর বিবেচনা করে এই র‍্যাংকিং করা হয়- সংসদে কতজন নারী সদস্য আছেন, মন্ত্রী পরিষদে কতজন নারী সদস্য আছেন এবং গত ৫০ বছরের মধ্যে কত বছর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নারী দায়িত্ব পালন করেছেন। র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের এগিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে গত ৫০ বছরে মধ্যে ২৯ দশমিক ৩ বছরই সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন নারী যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল। বাংলাদেশের অবস্থান এই ক্যাটাগরিতে প্রথম। কিন্তু বাকি দুইটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো নয়। সংসদে কতজন নারী সদস্য আছেন, এই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৯১তম এবং মন্ত্রী পরিষদে কয়জন নারী সদস্য আছেন এই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৩তম।[১১২]

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের রয়েছেন ৪৩ দশমিক ৮ শতাংশ সদস্য, স্নাতক পর্যায়ের রয়েছেন ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ সদস্য, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের রয়েছেন ৯ দশমিক ৬ শতাংশ, মাধ্যমিক পর্যায়ের রয়েছেন ৪ দশমিক ১ শতাংশ এবং ৪ দশমিক ১ শতাংশ এর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পর্যায়ের নিচে। ৪ দশমিক ১ শতাংশ সদস্য রয়েছেন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই।

সারণি ৬.২: নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

আসনের ধরন	স্নাতকোত্তর/ তদূর্ধ্ব	স্নাতক	উচ্চমাধ্যমিক	মাধ্যমিক	মাধ্যমিকের নিচে	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	মোট
নির্বাচিত	১১ (৪৭.৮%)	৮(৩৪.৮%)	২(৮.৭%)	০(০.০%)	১(৪.৩%)	১(৪.৩%)	২৩(১০০%)
সংরক্ষিত	২১(৪২.০%)	১৭(৩৪.০%)	৫(১০.০%)	৩(৬.০%)	২(৪.০%)	২(৪.০%)	৫০(১০০%)
মোট/সার্বিক	৩২(৪৩.৮%)	২৫(৩৪.২%)	৭(৯.৬%)	৩(৪.১%)	৩(৪.১%)	৩(৪.১%)	৭৩(১০০%)

পেশাভিত্তিক[১১৩] বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী রয়েছেন ৩৭ দশমিক শূন্য শতাংশ, আইনবিদ রয়েছেন ১২ দশমিক ৩ শতাংশ, রাজনীতিবিদ রয়েছেন ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ।

[১১০] বিস্তারিত দেখুন, https://www.banglanews24.com/election-comission/news/bd/693707.details

[১১১] প্রাগুক্ত

[১১২] বিস্তারিত দেখুন, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf

[১১৩] একাধিক পেশা বিবেচনা করা হয়েছে

সভাপতিমণ্ডলীর তালিকায় নারী সংসদ সদস্য

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যে সভাপতিমণ্ডলীর তালিকা তৈরি করা হয় সেখানে সভাপতি তালিকায় প্রতিটি অধিবেশনে একজন করে নারী সদস্য ছিলেন। ২২টি অধিবেশনে মোট ২০ জন নারী সদস্যকে মনোনিত করা হয় যাদের মধ্যে একজন নারী তিনটি অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর তালিকায় মনোনয়ন পান। মনোনয়ন প্রাপ্ত ২০ জন সদস্যই (১০০ শতাংশ) ছিলেন সরকারি দলের সদস্য। তাদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত আসনের সদস্য ছিল ১০ জন (৫০ শতাংশ) এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য ছিলেন (৫০ শতাংশ)। এখানে উল্লেখ্য সভাপতিমণ্ডলী হতে কোনো নারী সদস্যই স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করেননি।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

একাদশ সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৩৯টি কমিটিতে ৬৮ জন (২২.০ শতাংশ) নারী সদস্য রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬০ জন সরকারি দলের, ৬ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২ জন অন্যান্য বিরোধী দলের। মোট ১১টি কমিটিতে কোন নারী সদস্য নেই। একাধিক কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন ১৯ জন। ৫টি কমিটিতে সভাপতি হিসেবে পাঁচ জন (১১.১ শতাংশ) নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন[১১৪]।

অধিবেশনে নারী সদস্যদের উপস্থিতি

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের প্রতিটি কার্যদিবসে নারী সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৪৬ জন। ২২টি অধিবেশনের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ১০ দশমিক ৯ শতাংশ নারী সদস্য, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ নারী সদস্য, ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ নারী সদস্য এবং ২৬ শতাংশের কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ নারী সদস্য। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরাসরি নির্বাচিত আসনের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৫৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং সংরক্ষিত আসনের নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৬৬ দশমিক শূন্য শতাংশ।

চিত্র ৬.১: নারী ও পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র (শতাংশ)

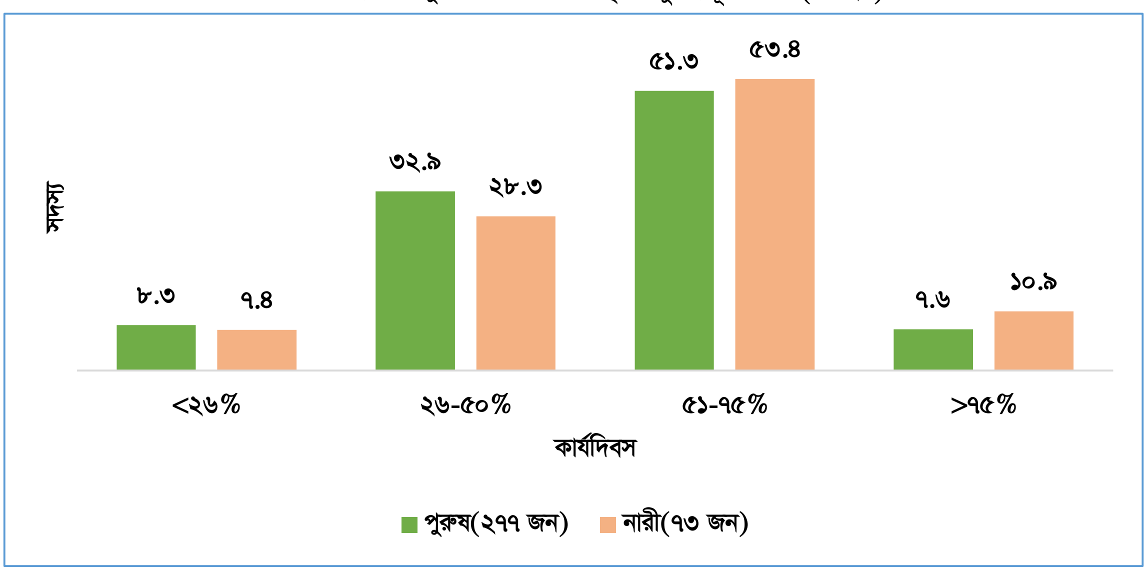

২২টি অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংসদ অধিবেশনে পুরষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার বেশি ছিল। নারী সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩ শতাংশ এর বিপরীতে পুরুষ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৫৩ শতাংশ। এছাড়াও ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে নারী সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতির হার কম ছিল।

---

[১১৪] যে ৫টি কমিটিতে পদাধিকারবলে সভাপতির পদ নির্ধারিত হয় সেগুলোকে বিবেচনা করা হয়নি

সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে স্পিকার ব্যতীত মোট ৭০ জন নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিল ৬৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের ০৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ০১ জন। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে নির্বাচিত আসনে সদস্য ছিলেন ২১ জন এবং সংরক্ষিত আসনে সদস্য ছিলেন ৪৯ জন। তবে সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে নারীদের মোট অংশগ্রহণের প্রায় ৫০ শতাংশই ছিল মাত্র ১৩ জন নারী সদস্যের দ্বারা।

কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় নারী সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় (৯১.৮ শতাংশ)। এরপরেই নারীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ ছিল বাজেটের ওপর আলোচনায় (৮৯.০ শতাংশ), ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিশ প্রদান (৪৫.২ শতাংশ) এবং সাধারণ আলোচনা পর্বে (৩৮.৪ শতাংশ)। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ। আইন প্রণয়ন পর্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম যথাক্রমে ১১ শতাংশ এবং ৪ দশমিক ১ শতাংশ। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে পাসকৃত বিলের ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ বিল দুই জন নারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এবং বিলের ওপর জনমত যাচাই ও সংশোধনী প্রস্তাবনা উত্থাপন করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাত্র ছয়জন নারী সদস্য। নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনা করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির ভাষণ আলোচনা এবং ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল পুরুষদের তুলনায় বেশি। অন্যান্য সকল কার্যক্রমেই পুরুষদের অংশগ্রহণ নারীদের তুলনায় বেশি ছিল।

চিত্র ৬.২: সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় লিঙ্গভেদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

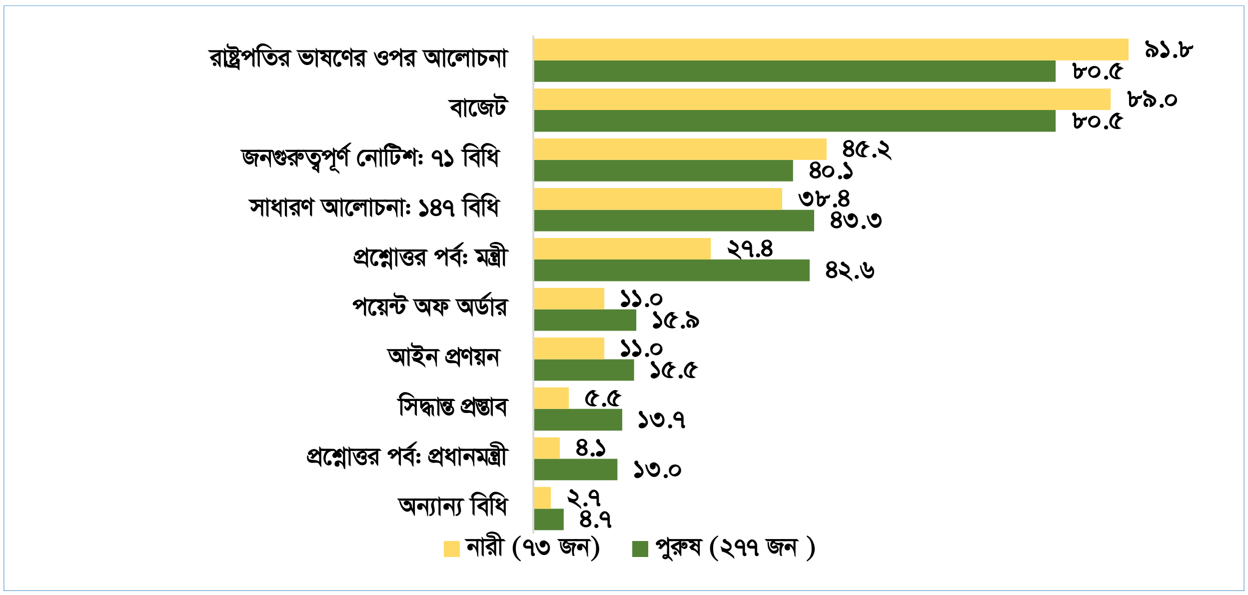

বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা

একাদশ সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বে সদস্যগণ নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ও সাধারণ আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করা হয়।[১১৫] বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বাজেট, বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে একাদশ সংসদের প্রথম ২২টি অধিবেশনে নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে।

[১১৫] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৮

একাদশ সংসদের প্রথম হতে একাদশ অধিবেশনে সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। মন্ত্রীদের প্রশ্নত্তোর পর্বে সংরক্ষিত আসনের সরকারদলীয় একজন নারী সদস্য সুনির্দিষ্টভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ সংশ্লিষ্ট সকল সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কিশোরী ক্লাবগুলোতে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন। সাধারণ আলোচনা পর্বের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের জলবায়ু কার্যক্রমের অধীনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মোট ২ ঘণ্টা ৯ মিনিট আলোচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে উন্নত দেশসমূহের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাংলাদেশসহ ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় সহয়তা দিয়ে এই ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মোট ১৬ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ১২ জন, প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলে দুইজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন দুইজন। চারজন নারী সদস্য এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, যাদের তিনজন ছিলেন সরকারি দলের এবং একজন ছিলেন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। এছাড়া সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে সংসদ সদস্যদের জন্য এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক 'ব্রেইন স্টরমিং সেশন'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার বলেন,"সংসদ ও সংসদ সদস্যদের সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সুশাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংসদ সদস্যদের দায়িত্বও বেড়ে গছে। সংসদ সদস্যদের সক্ষমতা বাড়িয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এসডিজি অর্জনে গতিশীলতা আনতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।"[১১৬]

তবে এই ২২টি অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত।[১১৭] এর মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা; বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন; জলবায়ু কার্যক্রম; শান্তি, ন্যায়বিচার, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেন,

> *"...টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার প্রতিষ্ঠানকে-সরকার, নির্বাচন, সংসদ, কর্ম কমিশন, দুদক-এগুলো শক্তিশালী করা; সেন্ট্রাল ব্যাংক হতে হবে টোটালি সেপারেট এবং স্বাধীন নীতিমালা থাকতে হবে... দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাওয়ার চিন্তাটা যদি বন্ধ হয়, মানুষকে বোঝাতে পারি তাহলে উন্নয়নকে টেকসই করতে পারব, না হলে উন্নয়ন টেকসই হবে না..."*

এছাড়াও পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখিত পর্বগুলোতে। বিশেষ করে শিক্ষার গুণগত মান, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি, কর্মসংস্থান, টেকসই নগর, জলবায়ু পরিবর্তন, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান, নিরাপদ অভিবাসন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে, যদিও তা সুনির্দিষ্টভাবে এসডিজি বাস্তবায়নকে লক্ষ্য করে আলোচিত হয়নি। পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যগুলো সম্পর্কেই কোনো না কোনো আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার ঘাটতি ছিল।

সংসদে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা কম হওয়া প্রসঙ্গে সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি বলেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদে আলাদা অধিবেশন হওয়া উচিত। [১১৮] এছাড়া তিনি আরও বলেন সরকারের উচ্চপর্যায়ে এসডিজি নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের মতামত পাওয়া যাবে। এ ছাড়া সরকারের উচ্চপর্যায়ে একধরনের জবাবদিহি তৈরি হবে। এসডিজি নিয়ে জাতীয় সংসদে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। অথচ জনপ্রতিনিধিরা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার মতে, পুরো এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের কথা খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে না। পুরোটা যেন সরকারের বাস্তবায়নের বিষয়। তিনি সুশীল সমাজকে এসডিজি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করার তাগিদ দেন। [১১৯]

[১১৬] বিস্তারিত দেখুন, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হলে এসডিজি অর্জন সহজ হবে: স্পিকার, বাংলা ট্রিবিউন, ১ অক্টোবর ২০১৯।

[১১৭] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৮

[১১৮]বিস্তারিত দেখুন, 'এসডিজি নিয়ে সংসদে আলাদা অধিবেশন দরকার: রেহমান সোবহান' দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০২০।

[১১৯]বিস্তারিত দেখুন, 'এসডিজি বাস্তবায়নে মূল বাধা অর্থপাচার' দৈনিক যুগান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

অন্যদিকে সংসদে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে একজন সংসদ সদস্য বলেন, আমাদের সংসদে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তাতে প্রান্তিক জনগণের উন্নয়নের কথা খুব কম। মাত্র তিন মিনিট হয় গরীব মানুষের কথা বাকি সবসময় জুড়ে অন্যান্য আলোচনায় ব্যস্ত থাকে সংসদ। বর্তমান সংসদ গরিব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না।[১২০]

সার্বিকভাবে, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়নে সংসদে আলোচনার ক্ষেত্র এখনও সন্তোষজনক নয় এবং এ বিষয়ে সংসদ সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতিও লক্ষ করা গেছে।

[১২০] বিস্তারিত দেখুন, 'এক শ্রেণির মানুষের উন্নয়নে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়' দৈনিক মানবজমিন, ২৮ জুন ২০১৯।

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং অনুচ্ছেদ ১১ মোতাবেক প্রজাতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভর এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (জনপ্রতিনিধিদের) মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। "জাতীয় সংসদ" যার ওপর প্রজাতন্ত্রের সার্বিক আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত সেখানে গণতন্ত্রের সুফল তখনই আসবে যখন একটি কার্যকর সংসদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আর সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদে জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এই বিষয়টি সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। টিআইবি পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৬ শতাংশ মানুষ মনে করেন সংসদ চলাকালে সংসদ সদস্যদের নিয়মিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এছাড়া ৯৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন সংসদ চলাকালে সরকারি ও বিরোধী দলের নেতার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।[১২১] সংসদে সদস্যদের উপস্থিতি এবং কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংসদ জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। এই অধ্যায়ে সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সদস্যদের এবং স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

সংসদে অধিবেশন চলাকালে নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সদস্যদের দায়িত্ব। একাদশ সংসদের প্রথম হতে দ্বাবিংশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ২৩২ দিন। প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিল ১৯২ জন সংসদ সদস্য যা মোট সদস্যের ৫৪ দশমকি ৯ শতাংশ। গড়ে সবচেয়ে কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিল অষ্টম অধিবেশনে অর্থাৎ ২০২০ সালের বাজেট অধিবেশনে। করোনাকালে অনুষ্ঠিত এই বাজেট অধিবেশনটি তুলনামূলক ভাবে স্বল্প সময়ে সমাপ্ত হয়েছি। নয় কার্যদিবসে সমাপ্ত হওয়া এই বাজেট অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৯১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন যা মোট সংসদ সদস্যের ২৬ দশমিক ১ শতাংশ। এছাড়া সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও চতুর্দশ অধিবেশনেও সংসদ সদস্যের উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলক ভাবে কম। গড়ে ৪০ শতাংশেরও কম সদস্য উপস্থিত ছিলেন এই কার্যদিবসগুলোতে। দ্বিতীয় হতে পঞ্চম এবং দ্বাবিংশ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলক বেশি। গড়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি সদস্য উপস্থিত ছিলেন এই কার্যদিবসগুলোতে। সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির হার ছিল চতুর্থ অধিবেশনে। এই অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে গড়ে ২৬৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন যা মোট সংসদ সদস্যের ৭৬ দশমিক ৯ শতাংশ।[১২২]

সার্বিকভাবে অধিবেশনগুলোতে সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতির হার ছিল ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রধান বিরোধীদলের ৫০ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৪৩ শতাংশ। নারী ও পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী সদস্যদের মধ্যে উপস্থিতির হার ছিল ৬৩ শতাংশ এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিতির হার ছিল ৫৩ শতাংশ।

সারণি ৮.১: সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক গড় উপস্থিতির হার (কার্যদিবস)

দলের নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	২৫% বা তার কম	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬% বা তার বেশি
সরকারি দল	৩১২ জন	৫.৮% (১৮)	২৭.৯% (৮৭)	৫৪.৮% (১৭১)	১১.৫% (৩৬)
প্রধান বিরোধী দল	২৬ জন	১৯.২% (৫)	৩০.৮% (৮)	৪২.৩% (১১)	৭.৭% (২)
অন্যান্য বিরোধী দল	১২ জন	২৫.০% (৩)	৩৩.৩% (৪)	৪১.৭% (৫)	০% (০)
মোট	৩৫০ জন	৭.৪% (২৬)	২৮.৩% (৯৯)	৫৩.৪% (১৮৭)	১০.৯% (৩৮)

গড়ে অধিকাংশ সদস্য ৫৪ শতাংশ (১৮৯ জন) শতকরা ৫১ থেকে ৭৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ (১০৭ জন) সদস্য শতকরা ২৬ থেকে ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ৬ শতাংশ (২১ জন) সদস্য ২৫ ভাগ বা তার কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৯ দশমিক ৪ শতাংশ (৩৩ জন) সদস্য। এক্ষেত্রে সরকারি দলের ৪ দশমিক ৫ শতাংশ সদস্য (১৪ জন) ২৫ শতাংশ বা তারও কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৩০ দশমিক ১ শতাংশ (৯৪ জন) সদস্য শতকরা ২৬ থেকে ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ (১৭৩ জন) সদস্য শতকরা ৫১ থেকে ৭৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন এবং ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৯ দশমিক ৯ শতাংশ (৩১ জন) সদস্য। বিরোধী দলের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ সদস্য (৪ জন) ২৫ শতাংশ বা তারও কম কার্যদিবসে

[১২১] আকরাম ও অন্যান্য, জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা, টিআইবি. ঢাকা. ২০০৯।

[১২২] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৬

উপস্থিত ছিলেন, ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ (৯ জন) সদস্য শতকরা ২৬ থেকে ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ (১১ জন) সদস্য শতকরা ৫১ থেকে ৭৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন এবং ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৭ দশমিক ৭ শতাংশ (২ জন) সদস্য। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সদস্য (৩ জন) ২৫ শতাংশ বা তারও কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ (৪ জন) সদস্য শতকরা ২৬ থেকে ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ (৫ জন) সদস্য শতকরা ৫১ থেকে ৭৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী দলের কোনো সদস্যই ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল না।

সারণি ৮.২: একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক গড় উপস্থিতির হার

দলের নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	২৫% বা তার কম	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬% বা তার বেশি
সরকারি দল	৩১২ জন	৪.৫% (১৪)	৩০.১% (৯৪)	৫৫.৫% (১৭৩)	৯.৯% (৩১)
প্রধান বিরোধী দল	২৬ জন	১৫.৪% (৪)	৩৪.৬% (৯)	৪২.৩% (১১)	৭.৭% (২)
অন্যান্য বিরোধী দল	১২ জন	২৫% (৩)	৩৩.৩% (৪)	৪১.৭% (৫)	০% (০)
মোট	৩৫০ জন	৬% (২১)	৩০.৬% (১০৭)	৫৪% (১৮৯)	৯.৪% (৩৩)

অষ্টম হতে একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চারটির মধ্যে তিনটি অধিবেশনেই গড় উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ কার্য দিবসে। অষ্টম, দশম ও একাদশ অধিবেশনে যথাক্রমে ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ, ৪৭ শতাংশ ও ৫৪ শতাংশ সদস্য ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। চারটি অধিবেশনের তিনটি সরকারি দলের গড় উপস্থিতির ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে বেশি থাকলেও একাদশ অধিবেশনে এসে তা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নবম অধিবেশনে সরকারি দলের অধিকাংশ উপস্থিতির হার (৪৬.৯ শতাংশ) ছিল ৭৬ বা তার বেশি শতাংশ কার্যদিবসে, যা অষ্টম ও দশম অধিবেশনেও প্রায় ৩০ শতাংশ এর মতো ছিল (যথাক্রমে ২৯.৯ শতাংশ ও ৩১ শতাংশ)। একাদশ সংসদে এসে এ হার কমে দাড়ায় ৯ দশমিক ৯ শতাংশে। প্রধান বিরোধী দলের ক্ষেত্রে অষ্টম সংসদে অর্ধেকেরও বেশি এবং নবম সংসদে শতভাগ সদস্যদের উপস্থিতি সীমিত ছিল ২৫ শতাংশ বা তারও কম কার্যদিবসে। দশম সংসদে এসে ৪১ শতাংশ সদস্য ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে এবং ৩১ শতাংশ সদস্য ৭৬ বা তার বেশি শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত থাকে। এবং একাদশ জাতীয় সংসদে এসে ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ সদস্য ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে এবং ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ সদস্য ৭৬ বা তার বেশি শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত থাকে। অন্যান্য বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও অষ্টম ও দশম অধিবেশনে অধিকাংশ উপস্থিতির হার ছিল ৫১ শতাংশ হতে ৭৫ শতাংশ এবং ৭৬ বা তার বেশি শতাংশ কার্যদিবসে। তবে একাদশ অধিবেশনে এসে তাদের গড় উপস্থিতির হার হ্রাস পায়। তাদের কোন সদস্যই ৭৬ বা তার বেশি শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল না।

সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা এবং মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট ২৩২ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ২১৮ দিন উপস্থিত ছিলেন যা মোট কার্যদিবসের ৯৩ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় নেতা মোট ৪৪ দিন উপস্থিত ছিলেন যা মোট কার্যদিবসের ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ দিন। ৮০ দশমিক ১ শতাংশ কার্যদিবসই বিরোধী দলীয় নেতা সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের সূচনা ও সমাপ্তির দিন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতার উপস্থিতির হার ছিল যথাক্রমে ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ ও ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে দেখা যায়, সংসদ নেতার উপস্থিতি বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি হতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।

অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদে সংসদ নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির হার ছিল যথাক্রমে ৪৮ দশমিক শূন্য শতাংশ, ৮০ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৮২ দশমিক শূন্য শতাংশ। এক্ষেত্রে দেখা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদে এসে তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতির হার ছিল যথাক্রমে ১২ দশমিক শূন্য শতাংশ, ২ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৫৯ দশমিক শূন্য শতাংশ। দশম সংসদে এসে বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার হ্রাস পেয়ে ২০ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে।

সার্বিকভাবে একাধিক জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনে মন্ত্রীদের গড় উপস্থিতি ছিল মোট কার্যদিবসের ৫৫ দশমিক ২ শতাংশ দিন।[১২৩] ২৬ থেকে ৫০ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ (৮ জন) মন্ত্রী, ৫১ থেকে ৭৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৬৫ দশমিক ২ শতাংশ (৫৫ জন) মন্ত্রী এবং ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে কোনো মন্ত্রীর উপস্থিতর হার লক্ষ করা যায়নি। সংসদে মন্ত্রীদের উপস্থিতির হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। নবম সংসদে যেখানে ৭৬ ভাগ বা তার বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিল ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ মন্ত্রী সেখানে একাদশ সংসদে এসে সে হার হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে।

[১২৩] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট

সারণি ৮.৩: নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে মন্ত্রীদের গড় উপস্থিতি[১২৪]

মন্ত্রীদের উপস্থিতি	শতকরা কার্যদিবসে উপস্থিতির হার (শতকরা)			
	২৫% বা তার কম	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬% বা তার বেশি
নবম জাতীয় সংসদ	০.০ % (০)	১৪.৩%	৫৩.১%	৩২.৭%
দশম জাতীয় সংসদ	২%	২৬%	৫৫%	১৭%
একাদশ জাতীয় সংসদ	০% (০)	৩৪.৮%(৮)	৬৫.২(৫৫)	০%(০)

সংসদীয় কার্যক্রমে[১২৫] **সদস্যদের অংশগ্রহণ**

নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সরকারি দলের অংশগ্রহণের হার ছিল বেশি। বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিকভাবে দলভিত্তিক গড় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ১০ দশমিক ৩ শতাংশ ও অন্যান্য বিরোধী দলের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ ১০টি বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে তিনজন সদস্য যাদের মধ্যে দুইজন প্রধান বিরোধী দলের ও একজন সদস্য অন্যান্য বিরোধী দলের। পাঁচ বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে মোট ৯০ জন সদস্য যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য রয়েছে ৭২ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের মোট আটজন সদস্য। কেবল একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ২৭ জন সদস্য যাদের ২৬ জন সরকারি দলের এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য রয়েছে। ২২ জন সদস্য কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি যার মধ্যে ১৯ জনই সরকারি দলের সদস্য।

কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ (২৯০ জন) ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ আলোচনায় এবং সবচেয়ে কম অংশগ্রহণ ছিল আইন প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনায়। ২২টি অধিবেশন জুড়ে মাত্র ২৪ জন সদস্য বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সরকারি দলের কার্যক্রম ছিল লক্ষণীয় ভাবে কম। সরকারি দলের মাত্র ছয়জন সদস্য বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করলে আইন প্রণয়ন (বিলের ওপর নোটিশ) কার্যক্রম ব্যতিত সকল কার্যক্রমে সরকারি দলের সদস্যদের প্রাধান্য। কিন্তু দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে প্রায় সকল কার্যক্রমেই বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের হার সরকারি দলের হতে বেশি ছিল। আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অর্ধেকই প্রধান বিরোধী দল এবং প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করে এ পর্বে তাদের অংশগ্রহণ ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অন্যদিকে অন্যান্য বিরোধী দল সংসদে সংখ্যার দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলেও আইন প্রণয়ন, বাজেট এবং জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোতে তাদের অংশগ্রহন ছিল প্রায় ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। এমনকি বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক অংশগ্রহণকারী ছিল এই দল হতে।

[১২৪] পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে অষ্টম সংসদের তুলনা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

[১২৫] এখানে কার্যক্রম বলতে ১৩টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, পয়েন্ট অফ অর্ডার, মুলতবি প্রস্তাব, ৭১ বিধি, ১৪৭ বিধি, ১৬৪ বিধি, ২৭৪ বিধি, ৩০০ বিধি এবং ৬২ বিধির ওপর আলোচনা।

চিত্র ৮.১: কার্যক্রমভিত্তিক বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণ (শতাংশ)

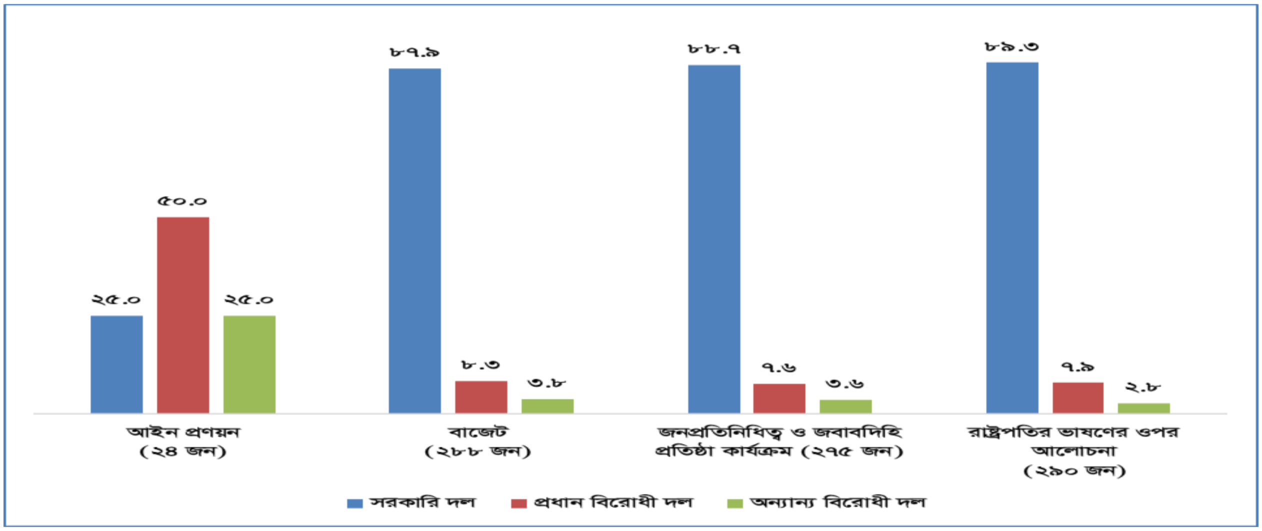

চিত্র ৮.২ : দলভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতাংশ)

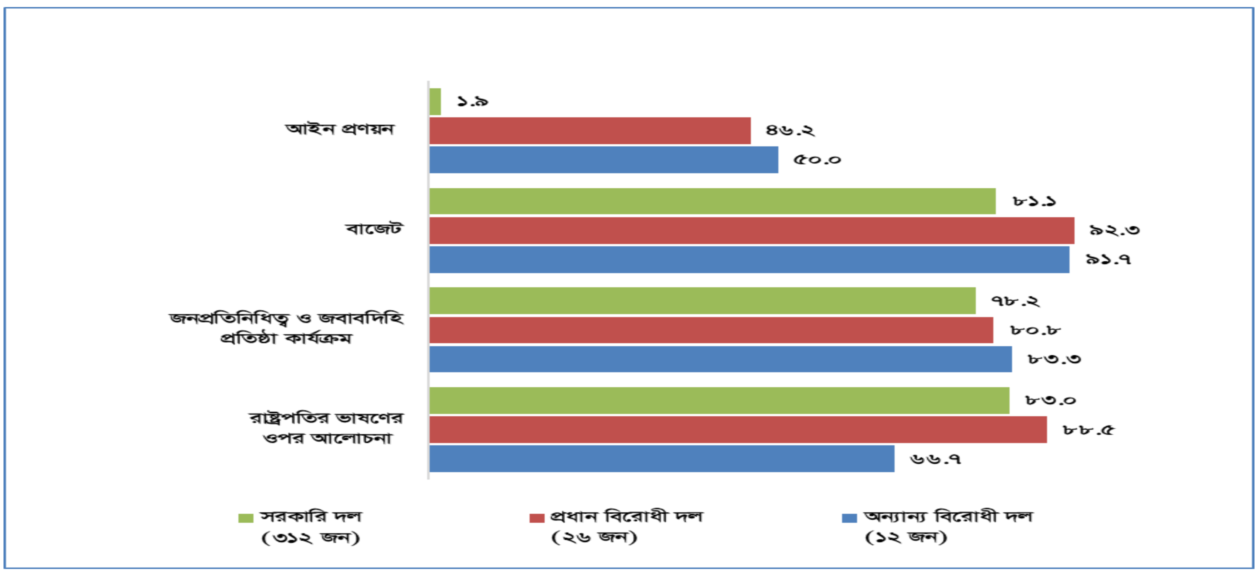

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা

সার্বিকভাবে সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতার অভাব এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সদস্যদের মধ্যে প্রস্তুতির ঘাটতি দেখা গেছে। প্রস্তুতি না থাকার কারণে কিছু সদস্যকে প্রস্তাব উত্থাপন না করার জন্য আবেদন জানাতে দেখা যায়। আবার মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে তথ্য প্রদান করা বিষয়টিও লক্ষ করা গেছে। একই বিষয়ক জিজ্ঞাসায় তারকাচিহ্নিত প্রশ্নে মৌখিকভাবে এক তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং তারকাবিহীন প্রশ্নের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে ভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানবিরোধী দলের একজন সদস্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নশীল এবং যাচাই-বাছাইপূর্বক তা প্রদান করার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও সদস্যদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নোটিশ দিয়েও নির্ধারিত দিনগুলোতে কিছু সদস্য একাধিকবার অনুপস্থিত থেকেছেন। নোটিশ দিয়ে একাধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে নোটিশ বারবার স্থগিত হয়ে গেছে এবং সংশোধনী অনুত্থাপিত থেকে গেছে। এছাড়াও নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বের দিবসগুলোতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে অন্য মন্ত্রীর দায়সারা উত্তর প্রদানের মাধ্যমে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের মূল উত্তর অনালোচিতই রয়ে গেছে। আবার একজনের নোটিশ অন্যজন উপস্থাপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ফলে সেখানে বিনা কারণে সংসদের সময়ক্ষেপন হয়েছে।

সংসদ কার্যক্রমে সদস্যদের অমনোযোগীতাও লক্ষণীয় ছিল। আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনার একটি করে মোট দুটি পর্বে কণ্ঠভোটের সময় সরকারি দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য নিজদলের বিপক্ষে ভোট প্রদানের পর স্পিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দ্বিতীয় দফায় ভোটে নিজ দলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন যা কার্যক্রমে অমনোযোগী থাকাকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের এই কার্যক্রমের জন্য বিরোধী দলের পক্ষ হতে প্রতিবাদও উত্থাপন করা হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে এক কার্যক্রমে অন্য কার্যক্রমের বিষয় উত্থাপন, প্রস্তাব উত্থাপনের ক্রম ভুল করা, বক্তব্য পেশ করতে না পারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনেকসময়ই দেখা গেছে কোনো বক্তা তার বক্তব্য পেশ করার সময় স্পিকার তাকে ক্রম ঠিক করে দিয়েছেন বা কিভাবে পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়াও দলের সদস্যরা এক্ষেত্রে পাশ থেকে বলে দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে একসাথে একাধিক ব্যক্তি কথা বলার কারণে সংসদে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে এবং একই সাথে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু বক্তার রিডিং নোটিশ পাঠ শুনে বক্তব্যে মূল বার্তা বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল। সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং অংশগ্রহণের জন্য সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংসদ কর্তৃক আয়োজিত মোট ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে দুইটি প্রশিক্ষণ ছিল সংসদ সদস্যদের জন্য।

সংসদ চলাকালে সদস্যদের আচরণ এবং স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ সদস্যদের একে অপরের প্রতি এবং সার্বিকভাবে সুশীল সমাজের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত আচরণ লক্ষ করা যায়। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার, কোনো কোনো নারী সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণীয় ছিল যা ২৭০ বিধির ৬-এর ব্যত্যয়। বিরোধী দলের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে নিম্নরূপ কিছু আক্রমণাত্মক ও আপত্তিকর শব্দ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

বিরোধী দলের প্রতি আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার

"খুনি, ঘাতক, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা, পাকিস্তানি এজেন্ট, পাকিস্তানি দোসর, কুখ্যাত মেজর, ছদ্মবেশী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খলনায়ক, কুলাঙ্গার, মূর্খ, অগ্নিসন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসের রাণী, দুর্নীতির বরপুত্র, দুর্নীতির বরপুত্রের জননী, মিথ্যাচারিনী, চোর, জঙ্গিনেতা, বিশ্ব বেয়াদব, জগৎ কুখ্যাত লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, লস্কর, দুর্নীতিতে অনার্স ও মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স ইত্যাদি

"বিএনপির মহিলা এমপি...খুনি তারেকের বান্ধবী, আপনি নারী হয়ে নারীর ধর্ষকদের বিচার চান না, নারীর সম্ভ্রমের কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই। অবশ্য আপনার মতো একজন নির্লজ্জ বেহায়ার কাছ থেকে দেশের ৮ কোটি নারী সমাজ এর থেকে বেশি কিছু আশা করে না..."

– ***সরকারি দলের একজন সদস্য***

এছাড়াও ২৬৭ বিধির ২, ৩, ৪, ৮, ৯- এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে বিশৃঙ্খল আচরণ করে বাধা প্রদান করা, সংসদীয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অডিও/ভিডিও ক্লিপ চালানো, অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে অন্য সদস্যদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন, সংসদ অধিবেশন চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, আলাপচারিতা করা, ঘুমানোর মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে মনোযোগ না দেওয়া, সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে টিকা-টিপ্পনী কাটা ইত্যাদি আচরণও লক্ষ করা গেছে। এছাড়াও প্রয়োজন ছাড়া শুধুমাত্র বাংলাতেই বক্তৃতা দেওয়া শর্ত থাকলেও বক্তৃতায় বিনা কারণে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে যা ৩০৫ (১) বিধির ব্যত্যয়।

সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা (কটূক্তি/আপত্তিকর শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের[১২৬] নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে জন্য সদস্যদেরকে সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ করা লক্ষ করা যায়নি যা বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়। এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় পরিচিতির উর্ধ্বে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্যদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একজন ডেপুটি স্পিকার দলীয় পরিচিতির জায়গায় থেকে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। সংসদ সদস্যদের বিধি মোতাবেক মতামত প্রকাশেও হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। একটি বিলের ওপর সদস্যদের আপত্তি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে স্পিকার স্বপ্রণোদিত ভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে জানান বিলটি তার অনুমতিতেই সংসদে এসেছে এবং সংসদ হতে ঐ বিলসহ আরো দুইটি বিল পাস করে দিতে হবে। তার এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে বিলের কার্যকারিতা যাচাই-বাছাই ও বিলের ওপর মতামত প্রকাশের যে অধিকার তা লঙ্ঘিত হয়েছে।

"...আমার অনুমতি সাপেক্ষেই এই বিলটি এসেছে... কেননা এর কিছু গুরুত্ব আছে... কেননা এই তিনটি বিল আমাদেরকে পাস করিয়ে দিতে হবে, কাজেই সেই বিবেচনায় আমি বিলটি আসার অনুমতি দিয়েছি... আপনাকে ধন্যবাদ"

- স্পিকার

[১২৬] স্পিকার বলতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যদেরকে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়াও অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকা পালনের ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। নিয়মিত স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতার অভাব (শৃঙ্খলা রক্ষা, ফ্লোর আদান-প্রদান ইত্যাদি)। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণেও ভূমিকা পালনের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

সংসদ বর্জন

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদে বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, "যেখানে বিরোধী দল নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই"। বিরোধী পক্ষ হিসেবে বিরোধী দলের ভূমিকা শুধুমাত্র বিরোধীতার খাতিরেই সরকারের বিরোধীতা করা নয় বরং, জনগণ, দেশ ও সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং প্রয়োজন মাফিক সরকারকে পরাশর্ম দেওয়া। কিন্তু এতো বছরেও কোনো দলই বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করে উঠতে পারেনি। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল। যখনই যে দল বিরোধী দলে থেকেছে তারা প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে গিয়ে সংসদ বর্জনের পথকে বেছে নিয়েছিল। ফলে অধিকাংশ সময়ই সংসদ কার্যক্রম চলে একতরফাভাবে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদে সংসদ বর্জনের এই হার ছিল ক্রমবর্ধমান- ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ, ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ, ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৮১ দশমিক ৮ শতাংশ। তবে দশম সংসদে এসে বিরোধী দল বর্জনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসে। একাদশ সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দশম সংসদে সরকারের অংশীদার থাকার কারণে এবং চলতি সংসদে অংশীদার না হলেও বিগত সময়ের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে তারা প্রকৃত অর্থে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

ওয়াকআউট

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনে মোট পাঁচবার ওয়াকআউট এর ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তিনবার দলীয়ভাবে ও একবার একজন সদস্য এককভাবে এবং গণফোরামের একজন সদস্য এককভাবে একবার ওয়াকআউট করেন। এক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ অধিবেশনের ৩য় ও ১৯তম এবং পঞ্চদশ অধিবেশনের ১ম কার্যদিবসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দলীয় ভাবে ওয়াকআউট করেন এবং একবিংশ অধিবেশনের ১৭তম কার্যদিবসে জাতীয় ফোরামের একজন সদস্য এককভাবে ওয়াকআউট করেন। "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচন বয়কট ও নির্বাচনবিরোধী আচরণ মূলত তাদের রাজনীতিবিরোধী প্রবণতাকে প্রকাশ করে যেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন নয় বরং রাজনৈতিক অপশক্তির ওপরে আশ্রয় করে ক্ষমতার চিন্তা করে"- সরকারি দলের একজন সদস্যসের এই ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্যকে ২য় বারের মতো দৃষ্টি আকর্ষণ পর্বে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে দলভাবে ওয়াকআউট করেন উক্ত দলটি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল, ২০২০" সংসদ থেকে প্রত্যাহার করে না নেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একাদশ অধিবেশনে ২য় বারের মতো দলীয়ভাবে ওয়াকআউট করেন। এই অধিবেশনে ৩য় বারের মতো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দলীয়ভাবে ওয়াকআউট করেন যখন উক্ত দলের একজন সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ পর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং মাননীয় স্পিকার কর্তৃক সে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বলা হয় তার প্রতিবাদে। এই অধিবেশনের ৪র্থ ওয়াকআউট হয় এককভাবে গণফোরামের একজন সদস্য কর্তৃক। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২৩ সংসদে যেন পাস না করা হয় তার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সংসদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। "স্থানীয় পৌরসভা সংশোধন বিল, ২০২২" এর ওপর প্রদত্ত সংশোধনী গ্রহণ না করার কারণে অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি দলের একজন সদস্য ওয়াক আউট করেন। ওয়াকআউট করে সদস্যরা সর্বনিম্ন তিন মিনিট হতে ২১ মিনিট পর্যন্ত সময় সংসদ কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন।

পদত্যাগ

২০তম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সকল সদস্যের (৭ জন) পদত্যাগ। শূন্য আসনের নির্বাচনে সরকারি দলের পাঁচজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য উক্ত আসনগুলো লাভ করে।

কোরাম সংকট

সংবিধানের ৭৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তত ষাটজন সংসদ সদস্য যদি বৈঠকে উপস্থিত না থাকে তাহলে জাতীয় সংসদের কোরাম পূরণ হয়নি বলে বিবেচিত হবে। কোরাম পূর্ণ করতে অন্তত ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে। সংসদ অধিবেশন নির্ধারিত সময়ে শুরু হওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের যথাসময়ে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত হওয়া জরুরি। কিন্তু জাতীয় সংসদের অধিকাংশ কার্যদিবসেই লক্ষ্য করা যায় কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন শুরু হতে বিলম্বিত হয়। এছাড়া মধ্যবর্তীকালীন বিরতি এবং নামাজের বিরতির পরও নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন শুরু হয় না। একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম হতে দ্বাবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত দেখা যায় যে, সংসদে প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময়[১২৭] ছিল ৮৪২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট, যেখানে কোরাম সংকটের জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট যা প্রকৃত ব্যয়িত সময়ের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ সময়। ২২টি অধিবেশনে কোরাম সংকটে

---

[১২৭] প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় = কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়িত মোট সময় + কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময় (৮৪২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট = ৭৮৭ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট + ৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট)

কার্যদিবস প্রতি গড় ব্যয়িত সময় ১৪ মিনিট ৮ সেকেন্ড। কার্যদিবস প্রতি মোট কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১ম হতে ৩য় ও ২১তম অধিবেশনে এই সময় ছিল সবচেয়ে বেশি, এক্ষেত্রে কোরাম সংকটের কারণে গড়ে ২০ মিনিটের থেকে বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে। অন্যদিকে ৭ম থেকে ১৬তম ও ২২তম অধিবেশনে সবচেয়ে কম সময় ব্যয়িত হয়েছে কোরাম সংকটের কারণে। এই অধিবেশনগুলোতে গড়ে ২ থেকে ৫ মিনিট সময় অপচয় হয়েছে কোরাম সংকটের কারণে।[১২৮]

কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত সময় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিবেশন শুরুর সময় হতে বিরতি পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে অধিক সময় কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়েছে। অধিবেশন শুরুতে কোরাম সংকটের কারণে মোট ব্যয়িত সময় ১৯ ঘণ্টা ৯ মিনিট যা কার্যদিবস প্রতি গড়ে ৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড এবং বিরতি পরবর্তী অধিবেশন শুরুর সময় কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত সময় ৩৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট যা কার্যদিবস প্রতি গড়ে ৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড। মোট ২৩২ কার্যদিবসের মধ্যে ১২৭ কার্যদিবসে অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন কারণে বিরতি নেওয়া হয় এবং ১০৫ কার্যদিবসে কোনো বিরতি গ্রহণ করা হয় না। যে দিবসগুলো বিরতি গ্রহণ করা হয় তার প্রতি বিরতিতেই সর্বনিম্ন এক মিনিট হতে সর্বোচ্চ ৫১ মিনিট পর্যন্ত সময় কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত হয়। ১২৭ কার্যদিবসে মোট ৪১ ঘণ্টা ৯ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করা হয় যেখানে কোরাম সংকটের কারণে তা দীর্ঘায়িত হয়ে ব্যয়িত হয় ৭৫ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট। অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে ১৮৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বিরতির জন্য। অন্যদিকে, মোট ১৯৪ কার্যদিবসে (৮৪ শতাংশ) নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এক মিনিট হতে সর্বোচ্চ ৩৫ মিনিট বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। মোট ৩৮ কার্যদিবসে (১৬ শতাংশ) কোনো বিলম্ব ছাড়াই নির্ধারিত সময়ে সংসদ কার্যক্রম শুরু হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ পরিচালনায় মিনিট প্রতি ব্যয় ছিল প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ টাকা। এ হিসেবে ১ম থেকে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি ২৮ লাখ ৮ হাজার ৭৭৯ টাকা। এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের অর্থমূল্য প্রায় ৩৮ লাখ ১৩ হাজার ৭৭৯ টাকা।

অষ্টম হতে একাদশ সংসদের কোরাম সংকটের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অষ্টম সংসদ হতে একাদশ সংসদে কোরাম সংকটের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদে যেখানে মোট কার্যঘণ্টার ২০ শতাংশ সময় কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়েছে তা নবম সংসদে এসে কিছুটা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ, দশম সংসদে তা ছিল ১২ শতাংশ এবং একাদশ সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত তার হার ৬ দশমিক ৫ শতাংশ রয়েছে। যদিও কোরাম সংকটের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু, এখনো শূণ্যের কোঠায় পৌঁছেনি। কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত সময় এবং রাষ্ট্রীয় ও জনগণের অর্থের অপচয় উদ্বেগজনক বিষয়।

সারণি ৮.৪: অষ্টম থেকে একাদশ জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের সময় ও প্রাক্কলিত অর্থমূল্যের তুলনা

অধিবেশন	মোট কোরাম সংকট (ঘণ্টা/মিনিট)	প্রতি কার্যদিবসে গড় কোরাম সংকট (মিনিট)	কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য (প্রায়)
অষ্টম	২২৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট	৩৭ মিনিট	২০.৪৫ কোটি টাকা
নবম	২২২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	৩২ মিনিট	১০৪.১৭ কোটি টাকা
দশম	১৯৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	২৮ মিনিট	১৬৩.৫৮ কোটি টাকা
একাদশ (প্রথম-দ্বাবিংশ)	৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট	১৪ মিনিট	৮৯.২৮ কোটি টাকা

তথ্যের উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত থাকলেও সংসদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে রেকর্ডকৃত অধিবেশনের কিছু কিছু অংশ অনুপস্থিত রয়েছে। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য ও সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংসদে ও কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

[১২৮] বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট ২৭

পূর্বের সংসদগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদের সাথে একাদশ জাতীয় সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সদস্যদের পেশার ধরন, উপস্থিতি, ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন, সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের হার, বিল পাসে ব্যয়িত সময়, কোরাম সংকট, স্থায়ী কমিটির গঠন ও বৈঠকে কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির হারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত অবস্থা, কখনো কখনো বৃদ্ধি, আবার কখনো হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথম সংসদের পর হতেই সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্তমানে একাদশ সংসদে এসে তা সর্বোচ্চ হয়ে ৬২ শতাংশ হয়েছে। সংসদে সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে সদস্যদের গড় উপস্থিতি অষ্টম হতে দশম সংসদ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আরোও হ্রাস পেয়ে অষ্টম সংসদের উপস্থিতির সমহারে ফিরে যায়। করোনাকালে অধিবেশনগুলো সংসদে সদস্যদের উপস্থিতি তুলনামূলক হ্রাস পাওয়ায় গড়ে উপস্থিতির হার সার্বিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একাদশ সংসদে সংসদ নেতা গড় উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ৯৪ শতাংশ কার্যদিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন যা অষ্টম সংসদের তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি দশম সংসদে পূর্বের দুটি সংসদের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একাদশ সংসদে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ কার্যদিবসে। ওয়াকআউটের প্রবণতাও ক্রমাগত হারে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অষ্টম সংসদে যেখানে ৯৯ বার ওয়াকআউট হয়েছিল সেখানে একাদশ সংসদে এসে ওয়াকআউট হয়েছে কেবল একবার। দশম সংসদ হতে সংসদ বর্জনের যে সংস্কৃতি হ্রাস পেয়েছিল তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

সারণি ৯.১: সদস্যদের পেশা, উপস্থিতি, ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জনের তুলনা (অষ্টম হতে একাদশ সংসদ)

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ	একাদশ সংসদ (চলমান)
পেশা (ব্যবসায়ী)	৫৮%	৫৭%	৫৯%	৬২%
সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫%	৬৩%	৬৩%	৫৫%
সংসদ নেতার গড় উপস্থিতি	৫২%	৮০%	৮২%	৯৪%
বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	১০%	২%	৫৯%	১৯%
ওয়াকআউট	৯৯ বার	৫৪ বার	১৩ বার	৫ বার
সংসদ বর্জন (কার্যদিবস)	৬০%	৮২%	০%	০%

সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের হার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, এখানে ব্যয়িত সময়ের হ্রাসের হার তেমন না হলেও অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। নবম সংসদে অংশগ্রহণে যে হার ছিল ৩২ শতাংশ তা একাদশ সংসদে এসে হয়েছে ১১ শতাংশ। অন্যদিকে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে ব্যাপক হারে। নবম সংসদে ব্যয়িত সময়ের যে হার ছিল ১৮ শতাংশ তা একাদশ সংসদে এসে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬ শতাংশ। আবার নবম সংসদে এ পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের যে হার ছিল ৮১ শতাংশ তা একাদশ সংসদে এসে হয়েছে ৩৯ শতাংশ। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের হার কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ব্যয়িত সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের অংশগ্রহণ দশম সংসদের তুলনায় ১০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। বিল প্রতি ব্যয়িত সময়ের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অষ্টম সংসদে যা ছিল গড়ে ২০ মিনিট তা একাদশ সংসদে এসে হয়েছে গড়ে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এক্ষেত্রে বিল পাসে ব্যয়িত সময়ের হার বাড়লেও গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত হয়নি।

সারণি ৯.২: সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (অষ্টম হতে একাদশ সংসদ)[১২৯]

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ	একাদশ সংসদ (চলমান)
রাষ্ট্রপতির ভাষণে ওপর আলোচনা (ব্যয়িত সময়)	-	১৭%	২২%	২৬%
রাষ্ট্রপতির ভাষণে ওপর আলোচনা (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	৩৯%	৮৫%	৮৫%	৮৩%
প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্ব (ব্যয়িত সময়)	-	৩%	৩%	২%
প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্ব (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	৩২%	২৭%	১১%
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (ব্যয়িত সময়)	-	১৮%	১৫%	৬%
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	৮১%	৭৩%	৩৯%
আইন প্রণয়ন (ব্যয়িত সময়)	৯%	৮%	১২%	১৭%
আইন প্রণয়ন (সদস্যদের অংশগ্রহণ)	-	১৬%	২৬%	১৫%[১৩০]
বিল পাসে ব্যয়িত সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট	১ ঘণ্টা ১০ মিনিট

কোরাম সংকটের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, কোরাম সংকট পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় হ্রাস পেলেও এ চর্চা অব্যাহত রয়েছে। অষ্টম সংসদে কার্যদিবস প্রতি গড় কোরাম সংকটের কারণে ব্যয়িত সময় ছিল ৩৭ মিনিট যা একাদশ সংসদে এসে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৮ মিনিট, যার মিনিট প্রতি প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার টাকা। এছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো পূর্ববর্তী দুইটি সংসদের মতোই প্রথম অধিবেশনেই গঠিত হয়েছে। তবে কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হারে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

সারণি ৯.৩: কোরাম সংকট ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিষয়ক তুলনা (অষ্টম হতে একাদশ সংসদ)

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ	একাদশ সংসদ (চলমান)
গড় কোরাম সংকট (কার্যদিবস প্রতি)	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট	১৮ মিনিট
কোরাম সংকটের মিনিট প্রতি প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য (টাকা)	১৫ হাজার	৭৮ হাজার	১ লাখ ৪০ হাজার	২ লাখ ৭২ হাজার
কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত মোট অর্থ মূল্য (টাকা)	২০ কোটি ৪৫ লাখ	১০৪ কোটি ১৭ লাখ	১৬৩ কোটি ৫৭ লাখ	৮৯ কোটি ২৮ লাখ
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	•সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন •বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	•প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন •২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস	•প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন •১টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য	•প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন •৪টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫%	৬৩%	৫৫%	৬০%

[১২৯] কিছুক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে অষ্টম সংসদের তুলনা করা সম্ভব হয়নি।
[১৩০] এক্ষেত্রে বিল উত্থাপনকারী সদস্যদেরসহ (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী) সহ হিসাব করা হয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে সংসদীয় কার্যক্রমে বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংসদে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দল হিসেবে সংসদীয় কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা পালন লক্ষণীয় ছিল যা সংসদকে কার্যকর করে তুলতে বিরোধী দলের শক্তিশালী ভূমিকা পালনের ঘাটতিকে চিহ্নিত করে। সংসদের মাধ্যমে জনগণের জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন এবং সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্ব এবং জবাবদিহি কার্যক্রমসমূহ। কিন্তু একাদশ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমসমূহে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত দিনে কার্যক্রম স্থগিত রাখা, চলমান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অনালোচিত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) একাদশ সংসদে এই পর্বগুলোতে মোট ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

সংসদীয় কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন কার্যক্রম। এক্ষেত্রে পূর্বের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, দক্ষতার ঘাটতি এবং গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। আইন প্রণয়নে সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে লক্ষ করা গেছে। এই অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত ছিল। বাজেট আলোচনায় সরকারি দলের সদস্যদের গঠনমূলক সমালোচনার সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সদস্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি। বরাবরে মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি অনুপস্থিত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস হয়। অন্যদিকে সংখ্যায় স্বল্প হলেও অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, অনির্ধারিত আলোচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বক্তব্য প্রদান করে তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের বক্তব্যে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা, ঘাটতি এবং সরকারের বিভিন্ন খাতে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির মতো বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্থাপিত ও আলোচিত জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য নোটিশ বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ সংসদ সদস্য তা করেননি। বিশেষকরে সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সমসাময়িক আলোচিত বিষয় উত্থাপন করতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার দাবি জানালেও তা গুরুত্ব পায়নি।

সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন ও প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনার প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যয়িত সময়ের একটা বড় অংশই প্রতিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনা করে ব্যয় করা হয়েছে। ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদেরকে অধিবেশন বর্জন করতে দেখা যায়নি। তবে এই সময়সীমার মধ্যে অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা মোট পাঁচবার ওয়াকআউট করেছে। কোরাম সংকটের জন্য ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ হ্রাস পেলেও তা এখনো অব্যাহত আছে এবং এর ফলে সংসদ কার্যক্রমের নির্ধারিত সময়ের উল্লেখযোগ্য সময় নষ্ট হয়েছে। সংসদে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে তা ৩৩ শতাংশ নিশ্চিত করা হয়নি। তবে অধিবেশনগুলোতে নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, যথাযথ গুরুত্ব সহকারে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটনো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

অধিকাংশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে যা স্বার্থের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিধি মেনে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান করা এবং সভায় উপস্থিত থাকার ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনাকালে জরুরি পরিস্থিতিতেও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো নিয়মিত বৈঠক করেনি। অন্যদিকে, সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা না থাকায় কমিটির কার্যকারিতায় সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে বিলম্বে প্রকাশ করায় এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া এখনও সহজসাধ্য নয়। অর্থাৎ সংসদীয় তথ্য উন্মুক্ততার চর্চায় ঘাটতি রয়েছে। সর্বোপরি সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। সংসদীয় কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ক্ষেত্রেও ঘাটতি ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন একাদশ সংসদ নির্বাচনে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে যা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা। সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নও দেখা যায়নি এই অধিবেশনগুলোতে। সার্বিকভাবে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম ২২টি অধিবেশন আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

সুপারিশ

গবেষণা ফলাফলের আলোকে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সংসদীয় কার্যক্রমসমূহকে কার্যকর করতে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো-

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা- জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়

২. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকলক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে

৩. সরকারি দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিরোধী দলের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে

৪. 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে

৫. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধে স্পিকারকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে

৬. অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা না করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ফলপ্রসূ আলোচনা নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান ও হুইপের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে

৭. সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৮. রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা থাকতে হবে

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

১০. আন্তর্জাতিক সব চুক্তি আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপন করতে হবে

১১. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সকল বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে

১২. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে

১৩. সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে

১৪. নিম্নলিখিত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে-

- সংসদ অধিবেশন ও কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি বিষয়ক তথ্য পৃথকভাবে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে
- সকল সংসদ সংদস্যদের পূর্ণাঙ্গ হলফনামা এবং সম্পদের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করতে হবে
- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করতে হবে
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিবেদন ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: একাদশ জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দল ও আসন সংখ্যা (২২তম অধিবেশন হতে)

রাজনৈতিক দল	মোট			
	নির্বাচিত আসন		সংরক্ষিত আসনসহ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সরকারি দল				
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬২	৮৭.৩	৩০৫	৮৭.১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	১.০	৪	১.১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৩	১.০	৪	১.১
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	০.৭	২	০.৬
তরিকত ফেডারেশন	১	০.৩	১	০.৩
জাতীয় পার্টি-জেপি	১	০.৩	১	০.৩
প্রধান বিরোধী দল				
জাতীয় পার্টি	২৩	৭.৭	২৭	৭.৭
অন্যান্য বিরোধী দল				
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	০	০	০	০.০
গণফোরাম	২	০.৭	২	০.৬
স্বতন্ত্র সদস্য	৩	১.০	৪	১.১
মোট	**৩০০**	**১০০**	**৩৫০**	**১০০**

পরিশিষ্ট ২: হলফনামা এবং সংসদের ওয়েবসাইটে একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের শিক্ষাগত তথ্যে অমিল

হলফনামার তথ্য	সংসদের ওয়েবসাইট	অমিল (জন)
উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক/স্নাতকোত্তর	একস্তর ওপরে/ একস্তর নিচে	৩৩
মাধ্যমিক	স্নাতক	২
স্বশিক্ষিত	স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৩

পরিশিষ্ট ৩: হলফনামা এবং সংসদের ওয়েবসাইটে একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের পেশাগত তথ্যে অমিল

হলফনামা	সংসদের ওয়েবসাইট	অমিল (জন)
ব্যবসায়ী	রাজনীতিবিদ/আইনজীবী/শিক্ষক	২২
কৃষিজীবী	ব্যবসায়ী/রাজনীতিবিদ	৫
রাজনীতিবিদ	আইনজীবী/শিক্ষক /ব্যবসায়ী	৫
অন্যান্য অমিল		১৪

পরিশিষ্ট ৪: একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যকাল (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল	মোট কার্যদিবস	ব্যয়িত সময়	বৈঠকভিত্তিক গড় ব্যয়িত সময়
১ম	৩০ জানুয়ারি ২০১৯	১১ মার্চ ২০১৯	-	২৬ দিন	১১৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	৪ ঘণ্টা ২৯ মিনিট
২য়	২৪ এপ্রিল ২০১৯	৩০ এপ্রিল ২০১৯	৪৩ দিন	৫ দিন	১৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
৩য়	১১ জুন ২০১৯	১১ জুলাই ২০১৯	৪১ দিন	২১ দিন	১০১ ঘণ্টা ০০ মিনিট	৪ ঘণ্টা ৪১ মিনিট
৪র্থ	৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৫৮ দিন	৪ দিন	১৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট
৫ম	৭ নভেম্বর ২০১৯	১৪ নভেম্বর ২০১৯	৫৫ দিন	৫ দিন	১৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট
৬ষ্ঠ	৯ জানুয়ারি ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৫৫ দিন	২৮ দিন	১০৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট
৭ম	১৮ এপ্রিল ২০২০	১৮ এপ্রিল ২০২০	৫৯ দিন	১ দিন	১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট
৮ম	১০ জুন ২০২০	০৯ জুলাই ২০২০	৫২ দিন	৯ দিন	২১ ঘণ্টা ২১ মিনিট	২ ঘণ্টা ২২ মিনিট
৯ম	৬ সেপ্টেম্বর ২০২০	১০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৫৮ দিন	৫ দিন	১২ ঘণ্টা ০০ মিনিট	২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট

অধিবেশন	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল	মোট কার্যদিবস	ব্যয়িত সময়	বৈঠকভিত্তিক গড় ব্যয়িত সময়
১০ম	৮ নভেম্বর ২০২০	১৯ নভেম্বর ২০২০	৪৮ দিন	১০ দিন	৩৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট
১১তম	১৮ জানুয়ারি ২০২১	২ ফেব্রুয়ারি ২০২১	৫৯ দিন	১২ দিন	৩৬ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩ মিনিট
১২তম	১ এপ্রিল ২০২১	৪ এপ্রিল ২০২১	৫৭ দিন	৩ দিন	৪ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট
১৩তম	২ জুন ২০২১	৩ জুলাই ২০২১	৫৮ দিন	১২ দিন	৩৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩ মিনিট
১৪তম	১ সেপ্টেম্বর ২০২১	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	৫৯ দিন	৭ দিন	১৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট	২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট
১৫তম	১৪ নভেম্বর ২০২১	২৮ নভেম্বর ২০২১	৫৮ দিন	৯ দিন	৩১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিট
১৬তম	১৬ জানুয়ারি ২০২২	২৭ জানুয়ারি ২০২২	৪৮ দিন	৫ দিন	১৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
১৭তম	২৮ মার্চ ২০২২	০৬ এপ্রিল ২০২২	৫৯ দিন	৮ দিন	২০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট
১৮তম	৫ জুন ২০২২	৩০ জুন ২০২২	৫৯ দিন	২০ দিন	৭৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট
১৯তম	২৮ আগস্ট ২০২২	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৫৮ দিন	৫ দিন	২২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট	৪ ঘণ্টা ২৬ মিনিট
২০তম	৩০ অক্টোবর ২০২২	৬ নভেম্বর ২০২২	৫৮ দিন	৬ দিন	২০ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট	৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট
২১তম	৫ জানুয়ারি ২০২৩	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৫৯ দিন	২৬ দিন	৭৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট	২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
২২তম	৬ এপ্রিল ২০২৩	১০ এপ্রিল ২০২৩	৫৫ দিন	৫ দিন	১৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট	২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট
মোট				**২৩২ দিন**	**৮২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট**	**৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট**

পরিশিষ্ট ৫: একাদশ জাতীয় সংসদের সভাপতিমণ্ডলী (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	সদস্যদের নাম	দল	আসন
১ম	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপর-১
	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ বাক্ষণবাড়ীয়া-৬
	জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন	সরকারি (আ'লীগ)	১৭২ মন্সীগঞ্জ-২ ১৫৩
২য়	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	১০ দিনাজপুর-৫
	জনাব এ, বি, এম ফজলে করিম চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	২৮৩ চট্টগ্রাম-৬
	জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	২৩ রংপুর-৫
	জনাব ফখরুল ইমাম	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৫৩ ময়মনসিংহ-৮
	বেগম আরমা দত্ত	সরকারি (আ'লীগ)	৩১১ মহিলা আসন-১১
৩য়	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর বিক্রম	সরকারি (আ'লীগ)	২৬৪ চাঁদপুর-৫
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাক্ষণবাড়িয়া-৫
	জনাব মোঃ হাবিবে মিল্লাত	সরকারি (আ'লীগ)	৬৩ সিরাজগঞ্জ-২
	বেগম মেহের আফরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৮ গাজীপুর-৫
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
৪র্থ	জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩৮ মৌলভীবাজার-৪
	জনাব এনামুল হক	সরকারি (আ'লীগ)	৫৫ রাজশাহী-৪
	জনাব মৃণাল কান্তি দাস	সরকারি (আ'লীগ)	১৭৩ মুন্সীগঞ্জ-৩
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম জয়া সেন গুপ্তা	সরকারি (আ'লীগ)	২২৫ সুনামগঞ্জ-২
৫ম	জনাব আ,স,ম, ফিরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১১২ পটুয়াখালী-২
	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	১৬ লালমনিরহাট-১
	জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম	সরকারি (আ'লীগ)	২১০ রাজবাড়ী-২
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম সেলিমা আহমাদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫০ কুমিল্লা-২
৬ষ্ঠ	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সরকারি (আ'লীগ)	২৫৫ কুমিল্লা-৭
	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৭ নওগাঁ-২

অধিবেশন	সদস্যদের নাম	দল	আসন
	কাজী কেরামত আলী	সরকারি (আ'লীগ)	২০৯ রাজবাড়ী-১
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	সৈয়দা জাকিয়া নুর	সরকারি (আ'লীগ)	১৬২ কিশোরগঞ্জ-১
৭ম	জনাব আ,স,ম, ফিরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১১২ পটুয়াখালী-২
	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম মেহের আফরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৮ গাজীপুর-৫
৮ম	জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান	সরকারি (আ'লীগ)	২১৫ গোপালগঞ্জ-১
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫
	জনাব মুহিবুর রহমান মানিক	সরকারি (আ'লীগ)	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম মেহের আফরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৮ গাজীপুর-৫
৯ম	জনাব আ, স, ম, ফিরোজ	সরকারি (আ'লীগ)	১১২ পটুয়াখালী-২
	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	১৬ লালমনিরহাট-১
	জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ	সরকারি (আ'লীগ)	১০৩ খুলনা-৫
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম সিমিন হোসেন (রিমি)	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৭ গাজীপুর-৪
১০ম	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সরকারি (আ'লীগ)	১৩৮ জামালপুর-১
	ড. শ্রী বীরেন শিকদার	সরকারি (আ'লীগ)	৯২ মাগুরা-২
	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
	উম্মে কুলসুম স্মৃতি	সরকারি (আ'লীগ)	৩১ গাইবান্ধা-৩
১১তম	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	১৯৯ নরসিংদী-১
	জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	১২ নীলফামারী-১
	জনাব আব্দুস সালাম মূর্শেদী	সরকারি (আ'লীগ)	১০২ খুলনা-৪
	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
	মমতাজ বেগম	সরকারি (আ'লীগ)	১৬৯ মানিকগঞ্জ-২
১২তম	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	সরকারি (আ'লীগ)	৬১ নাটোর-৪
	জনাব মৃণাল কান্তি দাস	সরকারি (আ'লীগ)	১৭৩ মুন্সিগঞ্জ-৩
	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু	সরকারি (আ'লীগ)	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২
	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
	বেগম সাহাদারা মান্নান	সরকারি (আ'লীগ)	৩৬ বগুড়া-১
১৩তম	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৭ নওগাঁ-২
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মবাড়ীয়া-৬
	জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান	সরকারি (আ'লীগ)	১ পঞ্চগড়-১
	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
	বেগম রুমানা আলী	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৪ মহিলা আসন-১৪
১৪তম	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৭ নওগাঁ-২
	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব আব্দুল মমিন মন্ডল	সরকারি (আ'লীগ)	৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫
	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
	শেখ এ্যানী রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	৩১৯ মহিলা আসন-১৯
১৫তম	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু	সরকারি (আ'লীগ)	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬

অধিবেশন	সদস্যদের নাম	দল	আসন
	বেগম বাসন্তী চাকমা	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৯ মহিলা আসন-৯
১৬তম	জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩৮ মৌলভীবাজার-৪
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
	জনাব মনজুর হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	২১১ ফরিদপুর-১
	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
	বেগম পারভীন হক শিকদার	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩৯ মহিলা আসন-৩৯
১৭তম	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার	সরকারি (আ'লীগ)	৪৭ নওগাঁ-২
	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব জুয়েল আরেং	সরকারি (আ'লীগ)	১৪৬ ময়মনসিংহ-১
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম শিরীন আহমেদ	সরকারি (আ'লীগ)	৩০১ মহিলা আসন-১
১৮তম	জনাব মোঃ শামসুল হক টুকু	সরকারি (আ'লীগ)	৬৮ পাবনা-১
	জনাব এ বি তাজুল ইসলাম	সরকারি (আ'লীগ)	২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
	জনাব মুহিবুর রহমান মানিক	সরকারি (আ'লীগ)	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫
	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
	মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম	সরকারি (আ'লীগ)	৩২১ মহিলা আসন-২১
১৯তম	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম	সরকারি (আ'লীগ)	২৬৪ চাঁদপুর-৫
	জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী	সরকারি (আ'লীগ)	৯ দিনাজপুর-৪
	জনাব আব্দুল মজিদ খান	সরকারি (আ'লীগ)	২৪০ হবিগঞ্জ-২
	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	২৮২ চট্টগ্রাম-৫
	বেগম আয়েশা ফেরদাউস	সরকারি (আ'লীগ)	২৭৩ নোয়াখালী-৬
২০তম	জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ	সরকারি (আ'লীগ)	২৩৮ মৌলভীবাজার-৪
	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	৭০ পাবনা-৩
	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	৩২ গাইবান্ধা-৪
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম সুবর্ণা মুস্তফা	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৪ মহিলা আসন-৪
২১তম	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন	সরকারি (আ'লীগ)	৩ ঠাকুরগাঁও-১
	জনাব এ. কে. এম শাহাজাহান কামাল	সরকারি (আ'লীগ)	২৭৬ লক্ষ্মীপুর-৩
	জনাব ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন	সরকারি (আ'লীগ)	২৫১ কুমিল্লা-৩
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম সালমা চৌধুরী	সরকারি (আ'লীগ)	৩৩৪ মহিলা আসন-৩৪
২২তম	জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান	সরকারি (আ'লীগ)	২৩ রংপুর-৫
	জনাব আসাদুজ্জামান নূর	সরকারি (আ'লীগ)	১৩ নীলফামারী-২
	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	সরকারি (আ'লীগ)	৭০ পাবনা-৩
	কাজী ফিরোজ রশীদ	প্রধান বিরোধী (জাতীয় পার্টি)	১৭৯ ঢাকা-৬
	বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ	সরকারি (আ'লীগ)	৩০৮ মহিলা আসন-৮

পরিশিষ্ট ৬: একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপালনের ব্যাপ্তিকাল (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
১ম	৮৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (৭২.৪%)	২৯ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট (২৫.৫%)	২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট (২.১%)	১১৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট
২য়	১৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট (৭২.৩%)	৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিট (২৭.৭%)	-	১৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
৩য়	৬৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট (৬৫.২%)	৩১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট (৩১.৩%)	০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট (০.৯%)	১০১ ঘণ্টা ০০ মিনিট
৪র্থ	১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট (৯৩.০%)	১ ঘণ্টা ০০ মিনিট (৭.০%)	-	১৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট
৫ম	১৭ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৯.৮%)	১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট (১০.২%)	-	১৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট
৬ষ্ঠ	৭৭ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট (৭৪.৬%)	২৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (২৩.৯%)	১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (১.৫%)	১০৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট
৭ম	১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট (১০০%)	-	-	১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট
৮ম	১৮ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট (৮৮.০%)	২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট (১২.০%)	-	২১ ঘণ্টা ২১ মিনিট

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
৯ম	৯ ঘণ্টা ২০ মিনিট (৭৭.৮%)	২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (২২.২%)	-	১২ ঘণ্টা ০০ মিনিট
১০ম	২৮ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট (৮১.২%)	৭ ঘণ্টা ৪২ মিনিট (২১.১%)	-	৩৬ ঘণ্টা ২৯ ঘণ্টা
১১তম	২৯ ঘণ্টা ৫২ মিনিট (%)	৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (১৮.৮%)	-	৩৬ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট
১২তম	৪ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট (১০০%)	-	-	৪ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট
১৩তম	৩৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট (১০০%)	-	-	৩৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
১৪তম	১৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট (১০০%)	-	-	১৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
১৫তম	৩০ ঘণ্টা ১২ মিনিট (৯৫.১%)	-	১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট (৪.৯%)	৩১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট
১৬তম	১৫ ঘণ্টা ৫১ মিনিট (৯০.৫%)	-	১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (৯.৫%)	১৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিট
১৭তম	১৯ ঘণ্টা ০৯ মিনিট (৯২.৪%)	-	১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট (৭.৬%)	২০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট
১৮তম	৫৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট (৭৪.০%)	-	২০ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট (২৬.০%)	৭৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট
১৯তম	১৮ ঘণ্টা ৩ মিনিট (৮১.২%)	৪ ঘণ্টা ১১ মিনিট (১৮.৮%)	-	২২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট
২০তম	১৫ ঘণ্টা ৬ মিনিট (৭২.০%)	৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট (২৮.০%)	-	২০ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট
২১তম	৫৬ ঘণ্টা ১৭ মিনিট (৭৩.৯%)	১৯ ঘণ্টা ৫২ মিনিট (২৬.১%)	-	৭৬ ঘণ্টা ০৯ মিনিট
২২তম	১১ ঘণ্টা ৪ মিনিট (৭৪.২%)	৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট (২৫.৮%)	-	১৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
মোট	**৬৪৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (৭৮.৩%)**	**১৪৮ ঘণ্টা ২২ মিনিট (১৮.০%)**	**৩০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট (৩.৭%)**	**৮২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট**

পরিশিষ্ট ৭: একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় (১ম-২২তম অধিবেশন)

সার্বিক কার্যক্রম	নির্দিষ্ট কার্যক্রম	ব্যয়িত সময়	শতকরা
রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনা	রাষ্ট্রপতির ভাষণ	৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট	০.৭
	রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা	১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট	২৫.১
আইন প্রণয়ন	বিল উত্থাপন ও পাস	১১৭ ঘণ্টা ০৬ মিনিট	১৫.৭
	বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন	৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট	১.০
বাজেট আলোচনা	বাজেট আলোচনা	১৪২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	১৯.২
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩ ঘণ্টা ২ মিনিট	১.৮
	মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট	৬.০
	৭১ বিধিতে (ক ও খ) আলোচনা	২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট	২.৯
	১৪৭ বিধিতে আলোচনা	৬৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট	৯.৩
	৬২, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০ বিধিতে আলোচনা	২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট	০.৩
	অনির্ধারিত আলোচনা	২২ ঘণ্টা ১১ মিনিট	৩.০
	বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	১.৫
	কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন	৫ ঘণ্টা ২১ মিনিট	০.৭
বিশেষ কার্যক্রম	বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার ও পদ্মা সেতুর ওপর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন	৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট	০.৬
	বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ	১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	০.২
	৭ মার্চ উপলক্ষ্যে সাধারণ আলোচনা	২ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট	০.৪
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম	কোরআন তিলওয়াত	১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	১.৪
	শোক প্রস্তাব	২৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট	৩.৫
	কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন	৫ ঘণ্টা ০০ মিনিট	০.৭
	সমাপ্তি ভাষণ (সংসদ নেতা, উপনেতা ও স্পিকার)	২২ ঘণ্টা ২ মিনিট	৩.০
	অন্যান্য*	২২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	৩.০
মোট		**৭৪৪ ঘণ্টা ১৩ মিনিট**	**১০০**

পরিশিষ্ট ৮: একাদশ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	কার্যদিবস	মোট ব্যয়িত সময়	শতকরা*
১ম	১২	৪ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট	৩.৬
২য়	৫	২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট	১.৮
৩য়	১১	১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট	৮.১
৪র্থ	৩	১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট	১.০
৫ম	৪	৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট	২.৬
৬ষ্ঠ	১৫	৮ ঘণ্টা ২১ মিনিট	৬.৬
৮ম	৭	৪ ঘণ্টা ০৪ মিনিট	৩.২
৯ম	৪	৬ ঘণ্টা ২১ মিনিট	৫.০
১০ম	৫	১০ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট	৮.৫
১১তম	৬	৬ ঘণ্টা ০০ মিনিট	৪.৭
১২তম	২	০ ঘণ্টা ৫১ মিনিট	০.৭
১৩তম	১০	৬ ঘণ্টা ৫১ মিনিট	৫.৪
১৪তম	৪	৯ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট	৭.৭
১৫তম	৬	১১ ঘণ্টা ১২ মিনিট	৮.৯
১৬তম	৪	৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট	৩.২
১৭তম	৮	১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট	৯.৮
১৮তম	১০	৩ ঘণ্টা ১৩ মিনিট	২.৫
১৯তম	৪	৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট	৩.৫
২০তম	৫	৬ ঘণ্টা ৩ মিনিট	৪.৮
২১তম	১৫	৯ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট	৭.৯
২২তম	১	০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট	০.৫

*আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

পরিশিষ্ট ৯: একাদশ সংসদের পাসকৃত বিল (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	পাসকৃত বিলের সংখ্যা	শতকরা
১ম	৫	৫.২
২য়	৩	৩.১
৩য়	৪	৪.২
৪র্থ	১	১.০
৫ম	৩	৩.১
৬ষ্ঠ	৭	৭.৩
৮ম	২	২.১
৭ম	০	০.০
৯ম	৬	৬.৩
১০ম	৯	৯.৪
১১তম	৬	৬.৩
১২তম	০	০.০
১৩তম	৪	৪.২
১৪তম	৯	৯.৪
১৫তম	৯	৯.৪
১৬তম	১	১.০
১৭তম	৯	৯.৪
১৮তম	১	১.০
১৯তম	৩	৩.১
২০তম	৪	৪.২
২১তম	১০	১০.৪

অধিবেশন	পাসকৃত বিলের সংখ্যা	শতকরা
২২তম	০	০.০

পরিশিষ্ট ১০: একাদশ সংসদের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিল পাসের হার (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

মন্ত্রণালয়ের নাম	পাসকৃত বিলের সংখ্যা	শতকরা
শিক্ষা	১৪	১৪.৬
আইন	১৩	১৩.৫
অর্থ	৭	৭.৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৭	৭.৩
নৌ পরিবহন	৪	৪.২
বাণিজ্য	৪	৪.২
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	৪	৪.২
বিমান	৪	৪.২
মৎস্য ও প্রাণি	৪	৪.২
শিল্প	৪	৪.২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৩	৩.১
স্থানীয় সরকার	৩	৩.১
ধর্ম	২	২.১
কৃষি	২	২.১
তথ্য	২	২.১
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২	২.১
মহিলা ও শিশু	২	২.১
সংস্কৃতি	২	২.১
সড়ক পরিবহন ও সেতু	২	২.১
স্বরাষ্ট্র	২	২.১
জনপ্রশাসন	১	১.০

পরিশিষ্ট ১১: একাদশ জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত সময় (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	ব্যয়িত সময়				
	বাজেট উপস্থাপন	সাধারণ আলোচনা		মঞ্জুরি দাবি	
		মূল বাজেট	সম্পূরক বাজেট	মূল বাজেট	সম্পূরক বাজেট
৩য়	১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৫১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট	৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট	০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
৮ম	০ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট	৪ ঘণ্টা ১১ মিনিট	১ ঘণ্টা ৬ মিনিট	২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট	১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট
১৩তম	১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট	১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট	১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট	১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট
১৮তম	২ ঘণ্টা ১০ মিনিট	৩৬ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	২ ঘণ্টা ২১ মিনিট	৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট	৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট
মোট	**৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট**	**১০৪ ঘণ্টা ৯ মিনিট**	**৯ ঘণ্টা ১ মিনিট**	**১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট**	**৬ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট**

পরিশিষ্ট ১২: একাদশ জাতীয় সংসদে বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় সদস্যদের দলভিত্তিক ব্যয়িত সময় (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

দল	সম্পূরক			মূল			মোট	শতকরা
	পুরুষ	নারী		পুরুষ	নারী			
		নির্বাচিত	সংরক্ষিত		নির্বাচিত	সংরক্ষিত		
সরকারি	৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট	০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	০ ঘণ্টা ২২ মিনিট	৬৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট	৯ ঘণ্টা ৪১ মিনিট	১০ ঘণ্টা ২০ মিনিট	৯১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট	৮০.৮
প্রধান বিরোধী	১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট	-	০ ঘণ্টা ১১ মিনিট	১০ ঘণ্টা ৫ মিনিট	১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট	১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট	১৩.৫
অন্যান্য বিরোধী	১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট	-	০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট	-	০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	৬ ঘণ্টা ২৩ মিনিট	৫.৬
মোট	৭ ঘণ্টা ৮ মিনিট	০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	১ ঘণ্টা ৩ মিনিট	৮০ ঘণ্টা ৬ মিনিট	১১ ঘণ্টা ৯ মিনিট	১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	১১৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট	১০০

পরিশিষ্ট ১৩: একাদশ জাতীয় সংসদে অর্থবিলের ওপর জনমত যাচাই ও সংশোধনী প্রস্তাব (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

দল	জনমত যাচাই			মোট	শতকরা	সংশোধনী			মোট	শতকরা
	পুরুষ	নারী				পুরুষ	নারী			
		নির্বাচিত	সংরক্ষিত				নির্বাচিত	সংরক্ষিত		
সরকারি	-	-	-	০	০.০	৯	১	১	১১	৪৫.৮
প্রধান বিরোধী	৭	-	১	৮	৬১.৫	৭	-	১	৮	৩৩.৩
অন্যান্য বিরোধী	৪	-	১	৫	৩৮.৫	৩	-	১	৫	২০.৮
মোট	১১	০	২	১৩	১০০	১৯	১	৩	২৪	১০০

পরিশিষ্ট ১৪: একাদশ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদান (১ম হতে ২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব		মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	
	কার্যদিবস	প্রশ্নের সংখ্যা	কার্যদিবস	প্রশ্নের সংখ্যা
১ম	৩	৬	১৫	১০৪
২য়	১	২	৪	৩৪
৩য়	১	২	৫	৩৭
৪র্থ	১	২	৩	১৯
৫ম	১	২	৪	২৫
৬ষ্ঠ	৪	৮	৩	১৭
৮ম	-	-	-	-
৭ম	১	২	-	-
৯ম	১	২	-	-
১০ম	-	-	-	-

অধিবেশন	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব		মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	
	কার্যদিবস	প্রশ্নের সংখ্যা	কার্যদিবস	প্রশ্নের সংখ্যা
১১তম	-	-	-	-
১২তম	-	-	-	-
১৩তম	-	-	-	-
১৪তম	-	-	-	-
১৫তম	-	-	-	-
১৬তম	-	-	-	-
১৭তম	১	১	-	-
১৮তম	-	-	৩	১৫
১৯তম	-	-	১	১৫
২০তম	১	১	৪	২৪
২১তম	৩	৫	-	-
২২তম	-	-	-	-
মোট	**১৮**	**৩৩**	**৪২**	**২৯০**

পরিশিষ্ট ১৫: একাদশ জাতীয় সংসদে মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক মূল প্রশ্নের সংখ্যা (১ম-২২তম অধিবেশন)

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা	শতকরা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২২	১১.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩	৬.৫
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২	৬.০
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১	৫.৫
অর্থ মন্ত্রণালয়	১০	৫.০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯	৪.৫
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	৯	৪.৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৭	৩.৫
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬	৩.০
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬	৩.০
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬	৩.০
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৬	৩.০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫	২.৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪	২.০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪	২.০
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৪	২.০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	১.৫
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩	১.৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩	১.৫
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩	১.৫
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৩	১.৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১	০.৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১	০.৫

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১	০.৫
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	০.৫
মোট	**২০০**	**১০০**

পরিশিষ্ট ১৬: একাদশ জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময় (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	কার্যদিবস সংখ্যা	ব্যয়িত সময়	শতকরা ব্যয়িত সময়*
১ম	১৪	২ ঘণ্টা ২০ মিনিট	১০.৫
২য়	৩	০ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট	২.৯
৩য়	৯	১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৬.৬
৪র্থ	২	০ ঘণ্টা ২২ মিনিট	১.৭
৫ম	৪	১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট	৫.৫
৬ষ্ঠ	১৫	১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট	৮.১
৮ম	৩	১ ঘণ্টা ২০ মিনিট	৬.০
৯ম	৩	০ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট	২.৮
১০ম	৩	০ ঘণ্টা ৮ মিনিট	০.৬
১১তম	১	০ ঘণ্টা ২ মিনিট	০.২
১২তম	২	০ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট	২.৬
১৩তম	৫	০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট	৩.৪
১৪তম	৩	০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	৪.১
১৫তম	৪	০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	৩.৮
১৬তম	৪	০ ঘণ্টা ২৩ মিনিট	১.৭
১৭তম	৫	১ ঘণ্টা ১১ মিনিট	৫.৩
১৮তম	১০	২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	১২.২
১৯তম	১	০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	২.৩
২০তম	৫	২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	১১.৭
২১তম	৯	১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	৭.২
২২তম	১০	০ ঘণ্টা ১২ মিনিট	০.৯
মোট	**১০৬**	**২২ ঘণ্টা ১১ মিনিট**	**১০০**

*অনির্ধারিত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে

পরিশিষ্ট ১৭: একাদশ জাতীয় সংসদে সাধারণ প্রস্তাব পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (১ম-২২তম অধিবেশন)

ক্রম	প্রস্তাব	ব্যয়িত সময়	শতকরা ব্যয়িত সময়	আলোচকের সংখ্যা					
				সরকারি দল		প্রধান বিরোধী দল		অন্যান্য বিরোধী দল	
				নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১	সন্ত্রাসী হামলা ও যৌন নিপীড়নের ঘটনার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ	৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট	৪.৭	৮	৫	০	৫	০	২
২	কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব	২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট	৩.৩	৩	৯	০	২	১	১
৩	২০২০ সালে জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক এবং কর্মময় জীবন ও দর্শনের ওপর জাতীয় সংসদে বিশেষ আলোচনা	১৯ ঘণ্টা ১৬ মিনিট	২৭.৭	১৪	৫৪	০	৯	০	৩

ক্রম	প্রস্তাব	ব্যয়িত সময়	শতকরা ব্যয়িত সময়	আলোচকের সংখ্যা					
				সরকারি দল		প্রধান বিরোধী দল		অন্যান্য বিরোধী দল	
				নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ‘ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি’ প্রবর্তন করায় ইউনেস্কোকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৩.৫	৪	৮	০	৬	০	১
৫	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা	১১ ঘণ্টা ৬ মিনিট	১৬.০	৭	৩৮	১	৮	১	৪
৬	‘জয় বাংলা’ কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণায় অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন	২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট	৩.৮	৪	১৩	০	৩	০	১
৭	পদ্মাসেতু প্রসঙ্গে	৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	৮.১	৫	২৬	১	৬	১	১
৮	কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অস্থিরতা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জ্বালানি সংকট, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলা করার নিমিত্তে সরকারের গৃহীত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই পদক্ষেপসমূহ সংসদে আলোচনার মাধ্যমে জাতিকে অবহিত করার প্রসঙ্গে	৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট	৭.০	৩	১৩	০	৮	১	২
৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের চক্রান্তকে পুনরায় সফল হতে না দেওয়ার প্রসঙ্গে	৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিট	৬.২	৩	১৬	০	৫	০	০
১০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে	২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট	৩.৯	২	৯	১	২	০	০
১১	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে	১০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট	১৫.৮	১৫	৪১	২	৫	০	১
	মোট	৬৯ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট	১০০.০	৬৮	২৩২	৫	৫৯	৪	১৬

পরিশিষ্ট ১৮: একাদশ জাতীয় সংসদে ৭১ বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণে প্রাপ্ত নোটিশ (১ম-২২তম অধিবেশন)

অধিবেশন	পুরুষ সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা			নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা			সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা		
	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
১ম	২২৪	৫২	০	২	২	০	০	০	০
২য়	৯১	১৫	৩	১	০	০	১৬	৩	০
৩য়	১০৩	১৯	১০	৫	০	০	২৬	৩	২
৪র্থ	৬৮	১২	৯	২	০	০	২১	২	২
৫ম	৬১	১১	৯	২	০	০	১৫	৩	২
৬ষ্ঠ	১০৮	১৮	২১	০	১	০	৩৩	৪	৪
২০তম	৪৩	৮	৩	০	০	০	১০	২	০

মোট	**৬৯৮**	**১৩৫**	**৫৫**	**১২**	**৩**	**০**	**১২১**	**১৭**	**১০**
শতকরা	**২.৮**	**৬.৭৫**	**৫.৫**	**০.৭**	**১.৫**	**০**	**২.৭৫**	**৪.২৫**	**৫**

পরিশিষ্ট ১৯: একাদশ জাতীয় সংসদে ৭১ (ক) বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণে আলোচিত নোটিশ (১ম-২২তম)

অধিবেশন	পুরুষ সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা			নির্বাচিত আসনের নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা			সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা		
	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
১ম	১২৩	২৯	০	১	২	০	০	০	০
২য়	৩১	৫	১	১	০	০	৬	১	০
৩য়	৪৫	৬	৪	২	০	০	১৫	১	২
৪র্থ	১৬	২	৩	১	০	০	৭	০	১
৫ম	১৭	৩	২	১	০	০	৬	০	১
৬ষ্ঠ	৩৩	৫	৫	০	০	০	১৫	০	২
২০তম	১৫	৪	১	০	০	০	৯	১	০
মোট	**২৮০**	**৫৪**	**১৬**	**৬**	**২**	**০**	**৫৮**	**৩**	**৬**
শতকরা আলোচিত*	**৪০.১**	**৪০.০**	**২৯.১**	**৫০.০**	**৬৬.৭**	**০.০**	**৪৭.১**	**১৭.৬**	**৬০.০**

* মোট উত্থাপিত নোটিশের মধ্যে কত শতাংশ আলোচিত হয়েছে

পরিশিষ্ট ২০: একাদশ জাতীয় সংসদে ৭১ (ক) বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আলোচিত নোটিশের সংখ্যা (১ম-২২তম)

মন্ত্রণালয়	নোটিশের সংখ্যা	শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬৪	১৫.১
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৫৭	১৩.৪
সড়ক পরিবহন ও সেতু	৪৯	১১.৫
শিক্ষা	৪৭	১১.১
পানিসম্পদ	৩১	৭.৩
স্বরাষ্ট্র	২৪	৫.৬
রেলপথ	১৮	৪.২
পরিবেশ ও বন	১৬	৩.৮
শিল্প	৯	২.১
সংস্কৃতি	৮	১.৯
নৌ পরিবহন	৮	১.৯
আইন, বিচার ও সংসদ	৮	১.৯
অর্থ	৭	১.৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৭	১.৬
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ	৭	১.৬
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন	৬	১.৪
যুব ও ক্রীড়া	৬	১.৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৬	১.৪
কৃষি	৫	১.২
মৎস ও প্রাণিসম্পদ	৫	১.২
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৫	১.২
মহিলা ও শিশু বিষয়ক	৪	০.৯
সমাজকল্যাণ	৩	০.৭
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৩	০.৭
বস্ত্র ও পাট	৩	০.৭

মন্ত্রণালয়	নোটিশের সংখ্যা	শতকরা
পরিকল্পনা	৩	০.৭
জন প্রশাসন	৩	০.৭
খাদ্য	২	০.৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান	২	০.৫
ভূমি	২	০.৫
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত	১	০.২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১	০.২
পররাষ্ট্র	১	০.২
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১	০.২
বাণিজ্য	১	০.২
অন্যান্য[১৩১]	২	০.৫
মোট	৪২৫	১০০.০

পরিশিষ্ট ২১: একাদশ জাতীয় সংসদে ৭১ (খ) বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক গৃহীত নোটিশের সংখ্যা (১ম-২২তম)

মন্ত্রণালয়	আলোচিত নোটিশের সংখ্যা	স্থগিতকৃত নোটিশের সংখ্যা	শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬	২	১৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৫	১	১২
পানি সম্পদ	৫	১	১২
শিক্ষা	৪	১	১০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৩	-	৬
অর্থ	২	-	৪
সড়ক পরিবহন ও সেতু	২	-	৪
মৎস ও প্রাণি সম্পদ	২	-	৪
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	২	-	৪
নৌ পরিবহন	২	১	৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২	-	৪
শিল্প	১	-	২
খাদ্য	১	-	২
কৃষি	১	-	২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১	-	২
বস্ত্র ও পাট	১	-	২
রেল যোগাযোগ	১	-	২
ভূমি	১	-	২
স্বরাষ্ট্র	-	২	৪
মোট	**৪২**	**৮**	**১০০**

পরিশিষ্ট ২২: একাদশ জাতীয় সংসদে ৭১ (খ) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক গৃহীত নোটিশসমূহের বিষয়বস্তু (১ম-২২তম)

মন্ত্রণালয়	নোটিশ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	<u>আলোচিত নোটিশ-</u> - ‘নির্বাচনী এলাকায় দুইটি দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ’ প্রসঙ্গে - ‘মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতালসহ রাজৈর ও সদর উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে জনবল পদায়ন’ - ‘ঔষধ মার্কেটে ভেজাল ও নকল ঔষধের রমরমা ব্যবসা’ প্রসঙ্গে - ‘নির্বাচনী এলাকা ৭৪ মেহেরপুর-২ এর অন্তর্গত গাংনী উপজেলায় দুইটি বিশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ’ প্রসঙ্গে

[১৩১] নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয়ভিত্তিক নয়।

	- 'ভয়ংকর রোটা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ' প্রসঙ্গে - 'ঔষধ ভেজালকারীদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ' প্রসঙ্গে
	স্থগিতকৃত নোটিশ- - 'ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নির্মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ' প্রসঙ্গে - 'নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ' প্রসঙ্গে
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	**আলোচিত নোটিশ-** - 'কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর বালিখলা হতে চারিতলা গ্রাম ও নিয়ামতপুর বালিখলা বড় রাস্তা হতে বালিয়াপাড়া ও খামশ্রী গ্রামের সামনে দিয়ে রাইজানি খাল হয়ে সুতার পাড়া গ্রামের দক্ষিণ মাথা পর্যন্ত সড়ক পাকাকরণ' প্রসঙ্গে - 'মঠবাড়ীয়া উপজেলার ৮০টি গ্রামের মানুষকে লবণাক্ততা ও আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পানের সুযোগ প্রদান' প্রসঙ্গে - 'কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নে গফরগাঁও দত্তের বাজার হতে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর দিয়ে চরফরাদী মিজাপুর বাজার পর্যন্ত সেতু নির্মাণ' প্রসঙ্গে - 'নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করা' প্রসঙ্গে - 'সাবমার্সিবল পাকা রাস্তা নির্মাণ' প্রসঙ্গে
	স্থগিতকৃত নোটিশ- - 'টাঙ্গাইল শহরের ঐতিহ্যবাহী ভাসানী হলটি পুনঃনির্মাণ' প্রসঙ্গে
পানি সম্পদ	**আলোচিত নোটিশ-** - 'নদী জীবন্ত সত্তা, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া' প্রসঙ্গে - 'কুড়িগ্রাম জেলাধীন তিস্তা ও ধরলা নদীর উভয় তীরে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ' প্রসঙ্গে - 'নদী ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ' প্রসঙ্গে - 'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলার জলাবদ্ধতা ও লোনা পানি অপসারণ' প্রসঙ্গে - 'চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন উড়িরচরকে নদী ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য উড়িরচরের চারিদিকে টেকসই ব্লক বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা' প্রসঙ্গে
	স্থগিতকৃত নোটিশ- - 'নদী ভাঙন কবলিত মনপুরা ও চরফ্যাসন উপজেলায় নদী ভাঙন রোধে প্রকল্প গ্রহণ' প্রসঙ্গে
শিক্ষা	**আলোচিত নোটিশ-** - 'সেকায়েপ প্রকল্পে কর্মরত প্রায় ৫,২০০ (পাঁচ হাজার দুইশত) জন তরুন মেধাবী এসিটিগণের চাকুরী স্থায়ীকরণ' প্রসঙ্গে - 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ' প্রসঙ্গে - 'জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় একটি সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন' প্রসঙ্গে - 'কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দামিহা উদয়ন কলেজ ও করিমগঞ্জ উপজেলার হাজী আব্দুল বারী মাস্টার কলেজ দু'টি এমপিওভূক্তকরণ' প্রসঙ্গে
	স্থগিতকৃত নোটিশ- - 'শের-ই-বাংলার স্মৃতি বিজড়িত চাখার সরকারি ফজলুল হক কলেজে শিক্ষকদের আবাসিক ভবন এবং ছাত্রাবাস নির্মাণ' প্রসঙ্গে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	**আলোচিত নোটিশ-** - 'সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদ পূরণসহ জরাজীর্ণ সকল ভবন সংস্কার ও নির্মাণ' প্রসঙ্গে - 'ঢাকা মহানগর উত্তরে অবস্থিত ৩০নং ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রসঙ্গে

	- ‘দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল, উপকূলীয় হাওর-বাওড়, পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিয়ন/স্থানীয় কোটায় শিক্ষক নিয়োগদানের নীতিমালা প্রণয়ন’ প্রসঙ্গে
অর্থ	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘শিল্প ঋণের সুদহারে শুভঙ্করের ফাঁকি’ প্রসঙ্গে - ‘ভারী বর্ষণ, ঝড়ো হাওয়া ও শিলা বৃষ্টির কারণে দাকোপ উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ তরমুজ চাষীদের সহায়তা’ প্রসঙ্গে
সড়ক পরিবহন ও সেতু	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘ভোলা জেলার ভোলা-চরফ্যাশন মহাসড়কের দৌলতখান উপজেলাধীন বাংলাবাজার ও বকশেআলী এবং বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন উত্তরমাথা বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন ও ডাওরী জরাজীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ বেইলিব্রীজ চারটি অপসারণ করে গার্ডারব্রীজ নির্মাণ’ প্রসঙ্গে- (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়) - ‘পঞ্চগড় শহরে বাইপাস সড়ক বা উড়াল সেতু নির্মাণ’ প্রসঙ্গে- (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপন’ প্রসঙ্গে - ‘নির্বাচনী এলাকা ৪৭ নওগাঁ-২ এর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় একটি “মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট” স্থাপন’ প্রসঙ্গে
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘প্রাণ ও পরিবেশঘাতি ইটভাটা, উদাসীনতা কাম্য নয়’ প্রসঙ্গে- (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) - ‘ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষাক্ত বর্জ্য থেকে এলাকার ফসলের ও মাছের ক্ষতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ’ প্রসঙ্গে- (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলাধীন যাদবপুর সীমান্তে স্থল বন্দর স্থাপন’ প্রসঙ্গে - ‘দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও নদীর মোহনা ড্রেজিং এর মাধ্যমে খনন করা’ প্রসঙ্গে
	স্থগিতকৃত নোটিশ- - ‘দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ফেরিঘাট সংস্কার এবং অপরিকল্পিতভাবে পদ্মা নদী ড্রেজিং করা’ প্রসঙ্গে
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘সুনামগঞ্জ পিটিআই বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ’ প্রসঙ্গে - ‘বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ও বোনাস বৃদ্ধি করা’ প্রসঙ্গে
শিল্প	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘আম সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আম প্রসেসিং যেমন-জুস ফ্যাক্টরী ও পাল্প ফ্যাক্টরী জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণকরণ’ প্রসঙ্গে
খাদ্য	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘অস্বাস্থ্যকর খাবারে লিভারের রোগ মহামারীতে রূপ নেয়া’ প্রসঙ্গে
কৃষি	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে শীর্ষে বাংলাদেশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা’ প্রসঙ্গে
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	**আলোচিত নোটিশ-** - ‘দেশী সফটওয়্যার শিল্পকে বাচাঁনোর জন্য বিদেশী সফটওয়্যার পরিহার করে দেশী সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধি’ প্রসঙ্গে
বস্ত্র ও পাট	**আলোচিত নোটিশ-**

	- ‘বন্ধ মাদারীপুর টেক্সটাইল মিল অবিলম্বে চালু করা’ প্রসঙ্গে
রেল	<u>আলোচিত নোটিশ-</u> - ‘একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা’ প্রসঙ্গে
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	<u>আলোচিত নোটিশ-</u> - ‘হেডম্যান ও কারবারীদের মাসিক ভাতা কমপক্ষে দ্বিগুন করা’ প্রসঙ্গে
স্বরাষ্ট্র	<u>স্থগিতকৃত নোটিশ-</u> - ‘ভয়ংকর ইয়াবার সর্বাত্মক প্রতিরোধ’ প্রসঙ্গে - ‘কোষ্টগার্ডের আধুনিকায়নের মাধ্যমে উপকূলে নিরাপত্তা জোরদারকরণ’ প্রসঙ্গে

পরিশিষ্ট ২৩: একাদশ জাতীয় সংসদে প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহের তালিকা (১ম-২২তম)

- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন উড়িরচরের চারিদিকে টেকসই বাঁধ নির্মাণ
- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুরে একটি স্থল বন্দর স্থাপন
- জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অর্থনৈতিক জোন স্থাপন করা
- শরীয়তপুর-১ নির্বাচনী এলাকার সদর উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমীর একটি নিজস্ব ভবন বা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা
- পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলার কাঁচা রাস্তা, পুরানো ইটের বিধ্বস্ত রাস্তা ও চলাচলের অনুপোযোগী রাস্তাগুলো পাকা করা
- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা সদরে একটি পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা
- ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় সরকারীভাবে একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করা
- জামালপুর জেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন রোধে জরুরি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে একশত শয্যায় উন্নীত করা
- সরকারি চাকুরিতে নিয়োগে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়স সীমা ৩০ বৎসর থেকে ৩৫ বৎসরে উন্নীত করা
- নোয়াখালী জেলার এমপিও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত এমপিওভুক্ত করা
- ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বরিশালের দোয়ারিকা সেতুটি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত অ্যাড-ভ্যালোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ (Specific Tax)
- পিরোজপুর-৩ নির্বাচনী এলাকার নদী ভাঙণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ
- ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকইল ও পীরগঞ্জ উপজেলার সকল কাঁচা রাস্তা পাকা করা
- নদী পথে ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের জন লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগরের মধ্যবর্তী স্থানে মেঘনা নদী তীরে একটি লঞ্চ ঘাট স্থাপন
- দেশে ঘুষ, সন্ত্রাস, ক্যাসিনো (জুয়া) ও মাদকসহ সকল সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান সারা বছর অব্যাহত রাখা
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত নয়াগোলা নামক স্থানে মহানন্দা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ
- পিরোজপুর জেলার বড়মাছুয়া-রায়েন্দা বলেশ্বর নদীতে একটি সেতু নির্মাণ
- চট্টগ্রাম-১১ নির্বাচনী এলাকায় ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপন করা
- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় একটি শিশু পার্ক স্থাপন
- চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার কুমিরা-গুপ্তছড়া নৌ-চলাচল রুটে যাত্রী পারাপার নিরাপদ করার লক্ষ্যে দুইটি হুবার ক্র্যাফ্ট চালু করা
- পিরোজপুর জেলার চরখালী-মঠবাড়ীয়া পাথরঘাটা সড়কের ব্রীজ কালর্ভাটগুলি নির্মাণ
- বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার জরাজীর্ণ রাস্তাসমূহ সংস্কারকল্পে এককালীন ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা অনুদান বরাদ্দ দেওয়া
- ভোলা জেলার লালমোহন এবং তজুমদ্দিন উপজেলা সদরে প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা
- ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা
- সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা ও মৌলভীবাজার জেলার রাজানগর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুশিয়ারা নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ
- বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম ও কাহালু উপজেলায় একটি করিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন
- বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার শিয়ালকাঠিস্থ সন্ধ্যা নদীর উপর অবিলম্বে একটি সেতু নির্মাণ করা
- নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ গ্যাস লাইন হইতে কটিয়াদি ও পাকুন্দিয়া উপজেলায় গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার সুন্দরবনের কোল ঘেষে বঙ্গোপসাগরের পাদদেশ গোলখালীতে একটি আধুনিক মানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন

- বরিশাল বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করা

পরিশিষ্ট ২৪: একাদশ জাতীয় সংসদে মুলতবি প্রস্তাব (বিধি ৬২)-এর বিষয়সমূহ (১ম থেকে ২২তম)

- তিনবারের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে
- কৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে আলোচনা প্রসঙ্গে
- বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্রুত নির্বাচনের জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে
- বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে
- বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর হামলা, নির্যাতন, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে
- রাজধানী স্থানান্তর প্রসঙ্গে
- আসামে এনআরসি প্রসঙ্গে
- বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ প্রসঙ্গে
- গুম বন্ধ প্রসঙ্গে
- নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ প্রসঙ্গে
- দুর্নীতি রোধ প্রসঙ্গে
- রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে
- সৌদিতে বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে
- সড়ক দুর্ঘটনা রোধ প্রসঙ্গে
- বেকার সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে
- ভেঙে পড়া আর্থিক খাত ঝুঁকিমুক্তকরণ প্রসঙ্গে
- শেয়ারবাজারে ক্রমাগত দরপতন প্রসঙ্গে
- চিকিৎসা সেবার মানবৃদ্ধি প্রসঙ্গে
- করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আশু করণীয় প্রসঙ্গে
- ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে
- সাম্প্রতিক সময়ের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা প্রসঙ্গে
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ প্রসঙ্গে

পরিশিষ্ট ২৫: একাদশ জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য প্রদান (১ম থেকে ২২তম)

অধিবেশন	বৈঠক	বক্তব্য প্রদানকারী	বক্তব্যের বিষয়বস্তু
১ম	১৪	অর্থ মন্ত্রী	২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে হ্যাকিং-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ-এ সংরক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চুরির প্রসঙ্গে
১ম	১৬	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী	দুষ্কৃতিকারি কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাইগামী বাংলাদেশ বিমান বিজি ১৪৭ ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনার প্রসঙ্গে
৩য়	১১	রেল মন্ত্রী	সিলেট থেকে ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল এলাকার বড়ছড়া খালের উপর কালভার্ট পার হওয়ার সময় সংঘটিত দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে
৪র্থ	৪	অর্থ মন্ত্রী	দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে
৫ম	৪	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী	মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের স্থগিত শ্রম বাজার উন্মুক্তকরণ প্রসঙ্গে
৫ম	৪	রেল মন্ত্রী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাধীন মন্দবাগ রেলওয়ে স্টেশনে সংঘটিত রেল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে
৬ষ্ঠ	২৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রী	সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেননের ফিলিস্তিন সম্পর্কে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিন সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের নীতি সম্পর্কে অবগতকরণ প্রসঙ্গে

অধিবেশন	বৈঠক	বক্তব্য প্রদানকারী	বক্তব্যের বিষয়বস্তু
৯ম	৪	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী	শ্রমবাজারের হালনাগাদ তথ্য প্রসঙ্গে
১২	৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী	২৬ মার্চ হতে ৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত মসজিদ মাদ্রাসাকেন্দ্রিক জটিলতা প্রসঙ্গে
১৬	৪	পররাষ্ট্র মন্ত্রী	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিএনপি-জামায়াতের অপতৎপরতার প্রতিবাদে বিএনপি সদস্যদের অসত্য তথ্যের অবতারণা এবং র‍্যাব ও সাতজন পুলিশকর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে বিএনপি ও সরকার কর্তৃক লবিস্ট নিয়োগ প্রসঙ্গে
১৮	২	পরিকল্পনা মন্ত্রী	ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ প্রসঙ্গে
১৮	১৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী	সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি ও পদ্মাসেতু প্রসঙ্গে
১৯	৫	পরিকল্পনা মন্ত্রী	বিবিএস প্রসঙ্গে
২২	১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী	৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বঙ্গবাজারে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে

পরিশিষ্ট ২৬: একাদশ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি (১ম থেকে ২২তম)

অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	গড় উপস্থিতি (জন)	গড় উপস্থিতি (শতকরা)
১ম	২৬ দিন	২১৪	৬১.১
২য়	৫ দিন	২৬২	৭৪.৮
৩য়	২১ দিন	২৫৩	৭২.৩
৪র্থ	৪ দিন	২৬৯	৭৬.৯
৫ম	৫ দিন	২৫৪	৭২.৬
৬ষ্ঠ	২৮ দিন	২২০	৬২.৮
৮ম	১ দিন	১৩৭	৩৯.১
৭ম	৯ দিন	৯১	২৬.১
৯ম	৫ দিন	১২০	৩৪.২
১০ম	১০ দিন	১২৭	৩৬.৪
১১তম	১২ দিন	১৩৫	৩৮.৫
১২তম	৩ দিন	১১৩	৩২.৩
১৩তম	১২ দিন	১৫২	৪৩.৫
১৪তম	৭ দিন	১৩৬	৩৮.৮
১৫তম	৯ দিন	১৬৪	৪৬.৮
১৬তম	৫ দিন	১৭৬	৫০.১
১৭তম	৮ দিন	১৬৪	৪৬.৮
১৮তম	২০ দিন	১৯৭	৫৬.৩
১৯তম	৫ দিন	২৩৯	৪৮.৪
২০তম	৬ দিন	২২৪	৬৪.০
২১তম	২৬ দিন	১৯২	৫৪.৯
২২তম	৫ দিন	২৫৯	৭৪.০
মোট	২৩২ দিন	১৮৬	৫৩.১

পরিশিষ্ট ২৭: একাদশ জাতীয় সংসদে কোরাম সংকট (১ম থেকে ২২তম)

অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	বৈঠকের শুরুতে কোরাম সংকট		বিরতির সময় কোরাম সংকট		সার্বিক	
		মোট	গড়	মোট	গড়	মোট	গড়
১ম	২৬ দিন	২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট	৬ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড	৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিট	১৪ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড	৯ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ড

অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	বৈঠকের শুরুতে কোরাম সংকট		বিরতির সময় কোরাম সংকট		সার্বিক	
		মোট	গড়	মোট	গড়	মোট	গড়
২য়	৫ দিন	০ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট	৬ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ৯ মিনিট	১৩ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট	২০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
৩য়	২১ দিন	৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট	৯ মিনিট ২৯ সেকেন্ড	৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট	১৪ মিনিট ০৩ সেকেন্ড	৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট	২৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট
৪র্থ	৪ দিন	০ ঘণ্টা ১০ মিনিট	২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট	১৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ৫ মিনিট	১৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৫ম	৫ দিন	০ ঘণ্টা ১১ মিনিট	২ মিনিট ১২ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ২ মিনিট	১২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট	১৪ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড
৬ষ্ঠ	২৮ দিন	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট	৫ মিনিট ২১ সেকেন্ড	৬ ঘণ্টা ২২ মিনিট	১৩ মিনিট ৩ সেকেন্ড	৮ ঘণ্টা ৫২ মিনিট	১৯ মিনিট ০০ সেকেন্ড
৮ম	১ দিন	০ ঘণ্টা ২ মিনিট	২ মিনিট ০ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ২ মিনিট	২ মিনিট ০ সেকেন্ড
৭ম	৯ দিন	০ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট	৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট	৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৯ম	৫ দিন	০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট	৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড
১০ম	১০ দিন	০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট	২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ৯ মিনিট	০ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট	৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
১১তম	১২ দিন	০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ০৮ মিনিট	০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ০২ মিনিট	৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড
১২তম	৩ দিন	০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট	৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট	৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড
১৩তম	১২ দিন	০ ঘণ্টা ২০ মিনিট	১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ২০ মিনিট	১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড
১৪তম	৭ দিন	০ ঘণ্টা ১২ মিনিট	১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড	-	-	০ ঘণ্টা ১২ মিনিট	১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড
১৫তম	৯ দিন	০ ঘণ্টা ২৩ মিনিট	২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট	২ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট	৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
১৬তম	৫ দিন	০ ঘণ্টা ১০ মিনিট	২ মিনিট ০০ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ১২ মিনিট	২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ২২ মিনিট	৪ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
১৭তম	৮ দিন	১ ঘণ্টা ২ মিনিট	৭ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড	-	-	১ ঘণ্টা ২ মিনিট	৭ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড
১৮তম	২০ দিন	০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট	২ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড	৪ ঘণ্টা ০৮ মিনিট	১২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড	৫ ঘণ্টা ০৩ মিনিট	১৫ মিনিট ৯ সেকেন্ড
১৯তম	৫ দিন	০ ঘণ্টা ১০ মিনিট	২ মিনিট ০০ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ০২ মিনিট	১২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ১২ মিনিট	১৪ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
২০তম	৬ দিন	০ ঘণ্টা ২০ মিনিট	৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ১১ মিনিট	১১ মিনিট ৫০ সেকেন্ড	১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট	১৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড
২১তম	২৬ দিন	৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট	৭ মিনিট ১৮ সেকেন্ড	৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট	১৬ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড	১০ ঘণ্টা ২৫ মিনিট	২৪ মিনিট ০২ সেকেন্ড
২২তম	৫ দিন	০ ঘণ্টা ১১ মিনিট	২ মিনিট ১২ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ০৬ মিনিট	১ মিনিট ১২ সেকেন্ড	০ ঘণ্টা ১৭ মিনিট	৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
মোট	২৩২ দিন	১৯ ঘণ্টা ০৯ মিনিট	০৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড	৩৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট	৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড	৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট	১৪ মিনিট ০৮ সেকেন্ড

পরিশিষ্ট ২৮: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক আলোচনা

লক্ষ্য	আলোচ্য বিষয়সমূহ
লক্ষ্য ১: দারিদ্র্য বিমোচন	দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত পদক্ষেপ ও সাফল্য, সামাজিক নিরপত্তা বেষ্টনি, বিভিন্ন ভাতা, চা শ্রমিকের পরিবারকে অর্থ বিতরণ ইত্যাদি
লক্ষ্য ২: ক্ষুধা মুক্তি	দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষকদের জন্য পল্লী রেশনের ব্যবস্থা ও যৌক্তিক ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, টিসিবিকে শক্তিশালী করা, খাদ্যে ভেজালরোধ ইত্যাদি
লক্ষ্য ৩: সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, বিভিন্ন পরিকল্পনা, পদক্ষেপ, বাস্তবায়ন, মাদক সমস্যা সমাধান ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি
লক্ষ্য ৪: মানসম্মত শিক্ষা	শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, সমন্বিত শিক্ষা আইন, প্রাইমারি স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চা বাগান এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ সমতা	নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাল্যবিবাহ রোধ, ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ, ডেজার্টেড ওমেন্স ইকুইটি, পার্বত্য এলাকার নারীদের উন্নয়নে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৬: বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন	এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ, টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা, আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র, বর্জ্য অপসারণে ইপিটি স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ৭: সাশ্রয়ী মূল্যের এবং দূষণমুক্ত শক্তি	বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়ন; পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন
লক্ষ্য ৮: শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	বেকারত্ব দূরীকরণে পদক্ষেপ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জটিলতা নিরসন, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, রেমিট্যান্স, রিজার্ভ বৃদ্ধি
লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো	রেললাইন ও রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণ, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, হাইটেক ও টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ, আইটি পার্ক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা
লক্ষ্য ১০: বৈষম্য হ্রাস	সরকারিভাবে শ্রমজীবী ও গ্রামীণ জনগণের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা, আয় বৈষম্য দূর করা, তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন, নিম্নবিত্তদের জন্য স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি
লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর এবং সম্প্রদায়	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেইনটেনেন্স স্কিম করা, গ্রামীণ রাস্তা প্রশস্ত করা, বস্তিবাসীদের জন্য শহরে ফ্ল্যাট নির্মাণ ইত্যাদি
লক্ষ্য ১২: পরিমিত ভোগ এবং উৎপাদন	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জটিলতা নিরসন, রিসাইক্লিং ইনসিনারেশন ব্যবস্থা
লক্ষ্য ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, নদী দূষণ রোধ, পদ্মা, মেঘনাসহ সকল নদী নিয়ে মাস্টার প্ল্যান ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৪: জলজ জীবন	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ঘোষণা, অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ রোধে আইন পাস ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৫: স্থলজ জীবন	বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, প্রাণিকল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে আইন পাস ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, দুর্নীতি রোধে আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ, নারী ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার, দুদকের স্বাধীনতা বৃদ্ধি ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ইত্যাদি
লক্ষ্য ১৭: লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশীদারিত্ব	ভারতের সাথে পানি চুক্তি, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের মাধ্যমে সীমান্তের হত্যা নিষ্পত্তি ইত্যাদি